বুঝা যাইতেছে যে, যে জিনিষ লঘু, তাহা তদপেক্ষা ভারি জিনিষের নীচে থাকিলেও, ক্রমাগত উপরে উঠিবার চেষ্টা করে, এবং ভারি জিনিষ নীচে গিয়া সেই লঘু জিনিষের স্থান অধিকার করে। একথা যেমন জলের সম্বন্ধে খাটে, তেমনি ঠিক বায়ুর সম্বন্ধেও খাটে। জল আমরা চক্ষে দেখিতে পাই, তাই জলের বিষয় সহজেই বুঝিতে পারি। বায়ু আমরা চক্ষে দেখিতে পাই না, তাই বায়ুর যে একটা ওজন আছে, বা একটী বায়ুস্তর হইতে যে আর একটী বায়ুস্তর ভারি বা হাল্‌কা হইতে পারে, তাহা তত সহজেই মনে হয় না। মৎস্য যেমন জলের মধ্যে ডুবিয়া রহিয়াছে, আমরা তেমনি বায়ুরাশির মধ্যে ডুবিয়া রহিয়াছি। আমাদের শরীরের প্রত্যেক ইঞ্চি পরিমাণ স্থানে যে বায়ুর চাপ পড়িতেছে, তাহার ওজন সাড়ে সাত সের। আমাদের মস্তকের উপর, এবং সমস্ত শরীরের উপর, কত মণ বায়ু চাপিয়া রহিয়াছে, একবার ভাবিয়া দেখ। জিজ্ঞাসা করিতে পার, যদি এত মণ বায়ুই আমাদের মাথার উপর চাপিয়া রহিয়াছে, তবে তাহা আমরা অনুভব করিতে পারি না কেন? তাহার কারণ এই, —আমাদের শরীরে যে সকল বাষ্প এবং তরল পদার্থ আছে, তাহা ক্রমাগতই বাহিরের দিকে উঠিবার চেষ্টা করিতেছে। আমাদের শরীরের ভিতরের এই শক্তি, এবং বায়ুর চাপের শক্তি সমান বলিয়া আমরা এত মণ বায়ুর চাপও অনুভব করিতে পারিতেছি না। যদি এমন স্থানে যাও, যেস্থানের বায়ু অপেক্ষাকৃত লঘু, তাহা হইলে দেখিতে পাইবে, তোমার শরীরের শীরা প্রভৃতি ফুলিয়া উঠিয়াছে এবং ফাটিয়া বাহির হইবার উপক্রম হইয়াছে। ইহার কারণ এই যে, সেখানকার বায়ুর চাপ অপেক্ষা শরীরের ভিতরের বাষ্প ও তরল পদার্থগুলির বাহিরের দিকে উঠিবার শক্তি বেশী। কিন্তু পৃথিবী হইতে তিন চারি ক্রোশ উপরে না উঠিলে আর ইহা দেখা সম্ভব নহে। পৃথিবীর কাছাকাছি যে বায়ুস্তর, তাহা সর্ব্বাপেক্ষা ভারি, পৃথিবী হইতে যতই উপরে উঠা যায় বায়ুরাশী ততই পাতলা হইয়া আসে। ইহার কারণ এই যে, বায়ুর পরমাণু গুলি ক্রমাগত উপরের দিকে উঠিবার জন্য চেষ্টা করিতেছে, কিন্তু পৃথিবী তাহাদিগকে আবার নিজ আকর্ষণী শক্তি দ্বারা কোলের দিকে টানিয়া রাখিতেছে; এই টানের প্রভাবে বায়ুর পরমাণু গুলিকে ঠেসাঠেসি করিয়া রাখিয়াছে। পৃথিবী হইতে যতই উপরে উঠা যায়, পৃথিবীর আকর্ষণী শক্তি ততই কম হইয়া আসে, এইজন্য বায়ুর পরমাণু গুলিও, ততই পৃথক হইয়া পড়ে এবং বায়ুরাশি ততই পাত্‌লা হইতে গিয়াছে। এ ছাড়া উপরের বায়ুরাশি চাপিতেছে বলিয়া নিচের বায়ুরাশি ঘন রহিয়াছে। পৃথিবী ছাড়িয়া আমরা যত উপরে উঠি, বায়ু ততই পাত্‌লা বোধ হয়; এবং অধিক উপরে উঠিলে, আমাদের নিশ্বাস লওয়া পর্য্যন্ত কঠিন হইয়া দাঁড়ায়। আরও একটী কথা, উত্তপ্ত হইলে বায়ু, জল প্রভৃতি তরল বস্তুর পরমাণু সকল বিচ্ছিন্ন হইয়া চারিদিকে ছড়াইয়া পড়ে, ইহাতেও বায়ু পাত্‌লা হইয়া যায়; এবং তরল বস্তু যত শীতল হইতে থাকে, ততই আবার সেই সকল বিচ্ছিন্ন পরমাণু সকল ঘনিবিষ্ট হইয়া গুরুত্ব প্রাপ্ত হয়। এই গুরু ভারযুক্ত বায়ুরাশি ক্রমাগত নীচের দিকে আসিতেছে, এবং নীচের যে লঘু বায়ুস্তর, তাহা ক্রমাগত উপরের দিকে উঠিবার চেষ্টা করিতেছে। এই কথাটী মনে করিয়া রাখিতে হইবে। জলের গতিতে বাধা পড়িলে যে পাক পড়ে, তাহা বোধ হয় তোমরা অনেকেই দেখিয়া থাকিবে? যখন প্রবল জল-

স্রোতে এই বাধা পড়ে, তখন ভয়ঙ্কর পাকের উৎপত্তি হয়, এবং এই আবর্ত্তে তখন বড় বড় নৌকাও নিমেষে ডুবিয়া যায়।

জল এবং বায়ুর একই অবস্থা; যেমন জলের তেম্‌নি বায়ুর গতিতেও বাধা পড়িলে, ঘূর্ণবায়ুর উৎপত্তি হয়। এইরূপে যখন খুব প্রবল বায়ুতে বাধা পড়ে, তখন প্রবল ঘূর্ণবায়ুর উৎপত্তি হয়। সূর্য্যের উত্তাপ বা অন্য কোন কারণে, যখন কোন স্থানে গ্রীষ্ম অত্যন্ত প্রবল হইয়া উঠে, তখন সেই স্থানের পৃথিবী সংলগ্ন বায়ুস্তরের পরমাণু সকল, পরস্পর বিচ্ছিন্ন হইয়া, পাত্‌লা হইতে থাকে এবং ক্রমাগত উপরের দিকে উঠিতে থাকে। এবং উপরের ও চারিদিকের অধিকতর ঘন বায়ুরাশি, নীচের সেই শূন্য স্থান আসিয়া অধিকার করে। এই কারণেই ঝড় হইয়া থাকে। এই ঊর্দ্ধ ও অধোগামী বায়ুর গতির উপরেই ঝড়ের বেগ নির্ভর করে, বায়ুরাশির গতি যত দ্রুত হইবে, ঝড়েরও বেগ তত অধিক হইবে। উপরের ও চতুষ্পার্শ্বের বায়ুর সহিত, নীচের বায়ুর একটা খুব প্রভেদ না থাকিলে ঝড় অথবা ঘূর্ণ বায়ু হইতেই পারে না। নীচের বায়ু যখন খুব উত্তপ্ত হইয়া অত্যন্ত পাত্‌লা হইয়া যায়, এবং উপরে ও চারি পার্শ্বের বায়ু শীতল ও ঘন থাকে, তখনই ঝড় বা ঘূর্ণবায়ুর উৎপত্তি সম্ভব। ঢাকায় ঘূর্ণবায়ু হইবার পূর্ব্বে ইহাই দেখা গিয়াছিল। পৃথিবী সংলগ্ন বায়ু উত্তপ্ত হইয়া খুব প্রবলবেগে উপরের দিকে উঠিতেছে, উপরের শীতল ঘন বায়ুরাশি, নীচের সেই শূন্যস্থান অধিকার করিবার জন্য, খুব প্রবল বেগে নীচের দিকে ছুটিয়াছে, আবার চারিদিকের বায়ুরাশিও তেমনি প্রবল বেগে নীচের শূন্য স্থানের দিকে আসিতেছে; যখন এই প্রকার ভিন্ন ভিন্ন দিক্‌গামী বায়ু প্রবাহের মধ্যে, একটা প্রবল ঘাৎ প্রতিঘাৎ ঘটে, তখনই ভয়ঙ্কর ঘূর্ণ বায়ুর সৃষ্টি হয়। এই ঘূর্ণবায়ুর আকার একটী প্রকাণ্ড স্তম্ভের ন্যায়, এই স্তম্ভের মধ্যস্থল এক প্রকার শূন্য বলিলেও হয়। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে শূন্য থাকে না, পৃথিবী সংলগ্ন উত্তপ্ত পাত্‌লা বায়ুরাশি এই পথে ঊর্দ্ধদিকে উঠিতে থাকে। বায়ুমণ্ডলে যখন এই ভয়ঙ্কর আবর্ত্তের সৃষ্টি হয়, তখন ইহার মুখে যাহাই পড়ুক না কেন, নিমিষে তাহা কেন্দ্রের দিকে আকর্ষিত হয়, এবং এই আবর্ত্তের মধ্যস্থিত শূন্যপথে ঊর্দ্ধে উৎক্ষিপ্ত হইয়া, চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া যায়। এই কথা কয়টী লিখিতে যে সময় লাগিল, কাজে ইহার শতাংশের একাংশ সময়ও লাগে না। ঢাকায় ইহা তিন মিনিট কাল ছিল, তাহাতেই কত স্থান ধ্বংস করিয়া গিয়াছে। এই উন্মত্ত ঘূর্ণবায়ুর গতির স্থিরতা নাই, ইহা কখনও বা মৃত্তিকা স্পর্শ করিয়া চলে, কখনও বা আকাশ পথে চলিতে থাকে। সংবাদ পাওয়া গিয়াছে যে, ঢাকার কোনও কোন স্থানের গৃহ এবং বৃক্ষ প্রভৃতি সমূলে উৎপাটিত হইয়াছে, আবার কোন দ্বিতল গৃহের উপরের তালাটী কেবল উড়াইয়া লইয়া গিয়াছে, কোনও স্থানের বা বৃক্ষ ও গৃহের উপরিভাগ মাত্র স্পর্শ করিয়া চলিয়া গিয়াছে। বায়ুর অবস্থার তারতম্যই বোধ হয় ইহার কারণ।

এই ভয়ঙ্কর ঘূর্ণবায়ুর সহিত আর একটী ভয়ঙ্কর কাণ্ড ঘটিয়াছিল। ইহার সঙ্গে অসংখ্য জ্বলন্ত অগ্নিপিণ্ড ইতস্ততঃ ছুটাছুটী করিতেছিল। এই ভয়ঙ্কর কাণ্ডের মধ্যে, সে দৃশ্য আরও কত ভয়ঙ্কর! এই অগ্নিপিণ্ড কি তাহা জানা যায় নাই। ইহা বিদ্যুতের কাণ্ড, অথবা বায়ুমণ্ডলে যে অসংখ্য উল্কাপিণ্ড রহিয়াছে, প্রবল আবর্ত্তে পড়িয়া সেই উল্কাপিণ্ড গুলিই ইতস্ততঃ ছুটিতেছিল, অথবা

ভিন্ন ভিন্ন বায়ু প্রবাহের সংঘর্ষণে এই অগ্নি উৎপন্ন হইয়াছিল, তাহা স্থির বলিতে পারা যায় না।

এই ঘূর্ণ বায়ুর সহিত মৎস্যাদি জলচর জীব ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইয়াছিল, এবং যে সকল স্থান দিয়া ইহা চলিয়া গিয়াছে, তাহার অনেক স্থান কর্দ্দমাক্ত দেখা গিয়াছে। ইহার কারণ এই যে, এই ঘূর্ণ বায়ু হয়ত ঢাকার নিম্নস্থ বুড়ীগঙ্গার উপর দিয়া গিয়া থাকিবে, এবং নদীর উপর দিয়া যাইবার সময়, জলস্তম্ভের সৃষ্টি করিয়া, জল ও মৎস্যাদি আকর্ষণ করিয়া লইয়া, তাহাই ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত করিয়া গিয়াছে। আমরা ঘূর্ণ বায়ুর বিবরণ দিলাম, সংক্ষেপে আর দুই একটী কথা বলিয়াই দীর্ঘ প্রবন্ধ শেষ করিব।

গত ২৬এ চৈত্র, ৭ই এপ্রেল প্রাতঃকাল হইতেই ঢাকাবাসীগণ অসহ্য গ্রীষ্ম অনুভব করেন, সমস্ত দিন এই গ্রীষ্মে দগ্ধ হইয়া, বৈকালে ৬টার সময় উত্তর ও পশ্চিম আকাশে একখানি মেঘ দেখিয়া, সকলেই বড় উৎফুল্ল হইয়া উঠেন। দেখিতে দেখিতে মেঘখানি বিস্তৃত হইয়া পড়িল, এবং ঘন ঘন বিদ্যুৎ ও গভীর মেঘ গর্জ্জন হইতে লাগিল। এদেশে এ কালে প্রায়ই এপ্রকার হইয়া থাকে, ইহা কিছুই নূতন নহে। মেঘখানা একটু লাল আভাযুক্ত ছিল। ক্রমে বাতাস একটু বেগে বহিতে লাগিল, এবং ক্রমে একটু বৃষ্টিও হইতে আরম্ভ হইল। কিন্তু ৭টার একটু পরেই, শত সহস্র বজ্র এককালে পতিত হইলে যে প্রকার ভয়ঙ্কর শব্দ উৎপন্ন হয়, তদপেক্ষাও যেন ভীষণ শব্দ শুনা গেল। বায়ু তখন উন্মত্তের ন্যায় ভয়ঙ্কর বেগে বহিতে লাগিল, এবং আকাশ হইতে অগ্নি বর্ষণ হইতে লাগিল। তিন মিনিটকাল এই প্রকার অবস্থা ছিল। সেই ভীষণ শব্দ ক্রমে বিলীন হইয়া গেল; অল্পক্ষণ পরেই আকাশ আবার পরিষ্কার হইয়া গেল, আকাশে নক্ষত্র ফুটিয়া উঠিল, প্রকৃতি শান্তির ভাব ধারণ করিল। কিন্তু তখন ঢাকা নগরী হইতে এক ভয়ঙ্কর হাহাকার শব্দ উত্থিত হইয়া আকাশ পূর্ণ করিয়া ফেলিল। এই তিন মিনিটের মধ্যে, ঢাকানগরীর বহুস্থান ধ্বংস হইয়া গিয়াছে—শত শত লোকের জীবন গিয়াছে, তাহা কে বুঝিতে পারিয়াছিল? এই দুর্ঘটনায় ঢাকা নগরীর কত স্নেহময়ী মাতার ক্রোড শূন্য হইয়াছে, কত স্ত্রী অনাথ হইয়াছে, কত ভাই বোনে চিরজীবনের মত বিচ্ছিন্ন হইয়াছে তাহার সংখ্যা নাই। একশতেরও অধিক মৃতদেহ এপর্য্যন্ত পাওয়া গিয়াছে, কত আহত হইয়াছে, তাহার সংখ্যা নাই, হাঁসপাতালে আর স্থান হইতেছে না। পুলিষ তদন্ত করিয়া বলিতেছেন, দশ লক্ষ টাকার ক্ষতি হইয়াছে;—কিন্তু কেহ কেহ বলেন ঢাকার নবাব সাহেবেরই ঐ পরিমাণ ক্ষতি হইয়াছে। নবাবের ইন্দ্রভবন—রঙ্গমহল ইষ্টকস্তূপে পরিণত হইয়াছে, নবাবের স্কুল গৃহ, আফিস ও অন্তঃপুর ভূতলশায়ী হইয়াছে; গ্যাসের কারখানা ছিন্ন ভিন্ন হইয়া গিয়াছে, এবং সহরের নিকটবর্ত্তী একস্থানে নবাবের যে বাগান ছিল, তাহাও ধ্বংস করিয়া গিয়াছে। ক্ষতি সর্ব্বাপেক্ষা নবাবেরই অধিক হইয়াছে। কিন্তু দানশীল পরদুঃখকাতর নবাব ইহাতে বিচলিত না হইয়া, ক্ষতিগ্রস্থ ঢাকাবাসীগণের দুঃখ দূর করিবার জন্য দশ সহস্র টাকা দান করিয়াছেন। ঢাকার আর একজন সম্পত্তিশালী ব্যক্তি, কপরাবু এবং তাহার ভ্রাতা রঘুবাবু, পাঁচ হাজার টাকা দান করিয়াছেন। অর্থের সদ্ব্যয় ইহা অপেক্ষা আর কি আছে? দুঃখীর দুঃখ দূর করাতেই অর্থের প্রকৃত সদ্ব্যয়।

আর দুই একটি কথা। একটী ছোট ছেলের ইটের চাপে পেট গলিয়া গিয়াছিল, বার বৎসর

বয়স্কা তার একটী ভগ্নী নিজের মাথায় সাংঘাতিক আঘাত পাইয়াও, ভাইএর কাছে বসিয়া আকুল-ভাবে কাঁদিয়া বার বার বলিতেছিল "হে পরমেশ্বর আমার প্রাণ নিয়া আমার ভাইএর জীবন রক্ষা কর।" ভগ্নীর স্নেহ স্বর্গের জিনিষ।

একটী বাবু তাঁহার কাঠের গোলাতে ছিলেন, গুরুতর আঘাৎ পাইয়া যখন তিনি চীৎকার করিতে লাগিলেন, "রক্ষা কর, রক্ষা কর" তখন তাঁহার এক জন কর্মচারী, নিজের জীবনের দিকে না তাকাইয়া, বুকের নীচে তাঁহাকে রাখিয়া বাঁচাইয়াছে। কর্মচারী বাঁচে কি না সন্দেহ। ইহাই প্রকৃত সৎকীর্ত্তি।

একটী যুবতীকে মৃত অবস্থায় নদীতে পাওয়া গিয়াছে। তাহার বুকের উপর বস্ত্রের দ্বারা একটী শিশু দৃঢ় বদ্ধ ছিল। উভয়ই মৃত। মা কিন্তু বুকের শিশুকে বুকেই রাখিয়াছেন, মা বুকের অসহায় শিশুকে অতি যত্নে বুকে রাখিয়া ইহলোক পরিত্যাগ করিয়াছেন! স্বর্গের শোভা আর কোথায়?

কতকগুলি অদ্ভুত ঘটনাও শুনা যাইতেছে; অদ্ভুত হইলেও কিছুই অসম্ভব নহে। নবাবের নহবৎ খানা হইতে একটী বালককে লালবাগে নিয়া ফেলিয়াছে, কিন্তু বালকটী জীবিত আছে। নহবৎখানা হইতে লালবাগ এক মাইলের অধিক।

নবাব বাড়ীর ইটের স্তূপের নীচে তিন দিন পরে একটী জীবিত মানুষ পাওয়া গিয়াছে।

শাঁখারী বাজারের তেতালার উপর একখানি গাড়ী পাওয়া গিয়াছে।

চক্ বাজারের কাছে একখানি জুড়ি গাড়ী, ঘোড়া সমেত শূন্যে উঠাইয়া লইয়া যায়, কোচ্‌মান লাফাইয়া পড়িয়া ঘোড়ার পা ধরিয়া টানিয়া রাখিয়াছে।

নদীতে একখানি নৌকায় ছয়জন লোক ছিল। তাহার একজনকে উড়াইয়া নদীর অপর পারে নর্ম্মাল স্কুলে ফেলিয়া দিয়াছে, লোকটী আহত হইয়াছে, কিন্তু মরে নাই। আর পাঁচজনের খোঁজ পাওয়া যাইতেছে না।

একটী স্ত্রীলোক শিশু কন্যা কোলে লইয়া বুড়ী গঙ্গার অপর পারে ছিল। ঘূর্ণবায়ুতে তাহাকে বিস্তীর্ণ বুড়ীগঙ্গার এপারে আনিয়া ফেলিয়াছে, কি প্রকারে আনিয়া ফেলিয়াছে সে কিন্তু বলিতে পারে না। মা ও মেয়ে কেহই কোন আঘাত পায় নাই।

চক্ বাজারের নিকট একটী লোককে শূন্যে কতকদূর উঠাইয়া আছড়াইয়া মারিয়া ফেলিয়াছে। কে জানে কবে প্রকৃতির একটী সামান্য নিশ্বাসে আমরাও নিমেষে কোন অনন্ত অজানা দেশে উড়িয়া যাইব?

---

## ধাঁধা।

### গতবারের ধাঁধার উত্তর।

জীবন।

---

### নূতন ধাঁধা।

বড়ই দুর্ব্বল আমি রমণী সমান।
আশ্রয় বিহনে মোর নাহি বাঁচে প্রাণ॥
ভূমিতে লুটায়ে কিম্বা পর পদতলে।
কাটায় জীবন মোর; ঘৃণয় সকলে॥
কিন্তু যদি উলটিয়া ধরহ আমায়।
হই আমি বলবান অতি মহাকায়॥
"ভীম প্রভঞ্জন" তবে কি করিতে পারে?
পথে ঘাটে থাকি আমি জান কি আমারে?

---




মে, ১৮৮৮।

# মুক্তি ফৌজ।

খৃষ্টধর্ম্মের মুক্তি ফৌজ (Salvation army) সম্প্রদায়ের নাম সকলেই শুনিয়াছেন। ইহাদের সৈন্যদল পৃথিবীর প্রায় সকল স্থানেই আছেন। পরোপকার ও কর্ত্তব্য সাধন ইহাঁদের জীবনের মহাব্রত।

বোধ হয় অনেকেই জানেন যে, লণ্ডন নগরে দরিদ্র লোকের সংখ্যা অত্যন্ত অধিক। এমন শত শত লোক আছে যাহাদের রাত্রিতে মাথা গুঁজিবার স্থান পর্য্যন্তও নাই। ইহারা অনেক সময় বড় বড় উদ্যানে (Park) ও রাস্তায় পড়িয়া থাকে। লণ্ডনে গরীব লোকের অত্যন্ত দুরবস্থা। সকল দেশেই পাপের ও অজ্ঞানতার স্রোত গরীব লোকের মধ্যেই বেশী প্রবাহিত—বিশেষতঃ লণ্ডনের দরিদ্রেরা অত্যন্ত মাতাল—ইহাদের অসাধ্য কোন দুষ্কর্ম্মই নাই। এই সকল লোককে ধর্ম্ম, জ্ঞান ও সুনীতির পথে আনিতে খুব সাহস, নৈতিক বল ও সহিষ্ণুতার আবশ্যক। মুক্তি-ফৌজ সম্প্রদায় ইহাদিগকে ধর্ম্ম ও নীতি শিক্ষা দানে কৃতসংকল্প হইলেন। কিন্তু কি উপায় অবলম্বন করিতে হইবে, এই চিন্তা তাঁহাদের মনে উদয় হইল। রাস্তায় দাঁড়াইয়া বক্তৃতা করিলে ইহারা শুনিবে না—চলে বক্তৃতা শুনিতে কখন আসিবে না—যদিই বা আসে তাহা হইলেও মুক্তি ফৌজ সম্প্রদায়ের হলে অত লোকের স্থান সংকুলান হওয়া কঠিন। এ সব উপায়ে ইহাদিগকে সুনীতির পথে আনা অসম্ভব। শেষে এই উপায়টী স্থির হইল—এই সকল দরিদ্র ও অজ্ঞান লোকদিগের বাসের পল্লীতে, ঠিক ইহাদের মত থাকিয়া ইহাদের সহিত মিলিয়া মিশিয়া ধীরে ধীরে ইহাদিগকে পরিবর্ত্তন করাই সঙ্গত। এই কার্য্যে খুব মানসিক বল ও সহিষ্ণুতা চাই। কে এই ভয়ানক মাতাল ও দুরাচারীদের সহিত বাস করিবে।।।

প্রথমে কেবলমাত্র দুইটী ভগিনী এই কার্য্য সাদরে গ্রহণ করিলেন। ওয়ালওয়ার্থে কার্য্য আরম্ভ হইল। এই দুইজন সাধুশীলা ভগিনী মলিনগৃহে, মলিনবেশে, মাতাল ও দুষ্টলোকদিগের পল্লীতে বাস করিয়া, ইহাদের বাড়ী বাড়ী ঘুরিয়া, পীড়ার সময় জননীরূপে শয্যার পার্শ্বে বসিয়া শুশ্রূষা করিয়া, বিপদের সময় উপদেশ দিয়া ও অর্থ সাহায্য করিয়া, উপদেশপূর্ণ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পুস্তকা সকল বিতরণ করিয়া, দিনরাত অবিশ্রান্তভাবে পরিশ্রম করিয়া এই সকল দরিদ্র দুরাচারীদের বন্ধু হইলেন। ইহাদের মনে ধর্ম্মের ভাব জাগরিত করিতে লাগিলেন। এইক্ষণ ইহাঁদের কার্য্যক্ষেত্র অনেক পরিসর হইয়াছে। এখন লণ্ডনে এই ভগিনীদের থাকিবার ১৬টী আবাস আছে। ইহাতে

৪০ জন ভগিনী থাকেন। এই সকল আবাস দরিদ্র-পল্লীতে ও ঠিক্ দরিদ্রদিগের মত। ইঁহারা বেতন-ভোগী নহেন—কেবল গরীবলোকদের মত থাকিতে যাহা কিছু ব্যয় হয় তাহাই লয়েন। এক বৎসর ইঁহারা যে কার্য্য করিয়াছেন শুনিলে আশ্চর্য্য হইতে হয়। এই সময়ের মধ্যে বহু সংখ্যক মাতালকে মদ্যপান হইতে বিরত করিয়াছেন, ৩০।৪০ জন পতিতা রমনীকে উদ্ধার করিয়াছেন ও ইহাদের ভরণ পোষণের সংস্থান করিয়াছেন। ১৭০০ জন লোক নিজ নিজ পাপ স্বীকার করিয়া যীশুখৃষ্টে বিশ্বাস করিয়াছে। ইহারা গত অধিবেশনের দিন প্রকাশ্য সভায় কৃতজ্ঞতা পূর্ণ বাক্যে সমস্ত উপকার স্বীকার করিয়াছে। ৯৬,৯৮৮ খানি দরিদ্রগৃহ পরিদর্শন করিয়াছেন ও সেখানে উপদেশ দিয়াছেন। ৩২,৫৬৯ বার দরিদ্রের বাড়ী যাইয়া ইহাদের পরিবারবর্গের সহিত একত্রে উপাসনা করিয়াছেন। এবং প্রায় ২১২০ জন নিরুপায় লোকের অন্ন বস্ত্রাদি যোগাইয়াছেন। এই সকল মহৎকার্য্য রাস্তায় রাস্তায় ব্যাণ্ড বাজাইয়া বা বক্তৃতায় সাধিত হয় নাই। খুব সহিষ্ণুতার সহিত ধীরে ধীরে ইহাদের সহিত মিলিয়া মিশিয়া ইহাদের দুঃখে দুঃখী হইয়া এই কার্য্য সাধন করিতে হইয়াছে। এ রকম না করিয়া শুধু বক্তৃতা করিয়া ইহাদিগকে ধর্ম্মের পথে আনা যায় না। আমাদের দেশেও দরিদ্রদের অবস্থা বড় শোচনীয়। জাহাজের খালাসী প্রভৃতির দুরবস্থা দেখিলে বড়ই কষ্ট হয়, ইহারা যাহা পায় সমস্তই মদ খাইয়া ফেলে—ইহাদের চরিত্র সংশোধনের কি কোন উপায় নাই—আছে বই কি? শুধু বক্তৃতার ছটায় কিছু হইবার আশা নাই, ইহাদের সহিত মিশিয়া, ইহাদের দুঃখের ও কষ্টের সময় সহানুভূতি প্রকাশ না করিলে কৃতকার্য্য হইবার আশা নাই। গত বৎসর সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজের কয়েকটী সঙ্গদয় ব্যক্তির উদ্যোগে স্বর্গীয় ডাক্তার অন্নদাচরণ কাস্তগিরির বাটীতে কতকগুলি দেশী খালাসীকে আহ্বান করিয়া চা, কমলালেবু প্রভৃতির দ্বারা পরিতুষ্ট করা হইয়াছিল। এই সকল লোককে ও এই রকম অবস্থাপন্ন অন্যান্য দুঃখী লোকদিগকে ধর্ম্মের পথে আনিতে পারিলে একটী মহৎ কর্ত্তব্য সাধন করা হইবে।

সে দিন বোম্বাই সহরে এই মুক্তি-ফৌজ সম্প্রদায়ের একজন কাপ্তেন তত্রস্থ প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট ক্রফিবেভী সাহেবের নিকট বলেন যে, তাঁহার নিকট মদ খাইয়া মাতলামি অভিযোগে অভিযুক্ত ব্যক্তিদিগকে তিনি স্বয়ং কোন দণ্ড না দিয়া মুক্তি-ফৌজ সম্প্রদায়ের হস্তে অর্পন করেন—এই সম্প্রদায়ই এই সকল মাতালকে মদ্যপান হইতে বিরত করিয়া ধর্ম্মের পথে আনিবেন। বোম্বাই সহরে মুক্তি-ফৌজ সম্প্রদায় অনেক মাতালকে ভাল করিয়াছেন। মুক্তি-ফৌজ সম্প্রদায়ের দ্বারা যে অশেষ হিতকর কার্য্য সকল সাধিত হইতেছে সন্দেহ নাই।—ইহাদের সদ্দৃষ্টান্ত সকলেরই অনুকরণীয়।



# আলোক পরীক্ষা।



কোন একটী জিনিস জান্‌তে হ'লে তার বিষয় অনুসন্ধান কর্‌তে হয়, সেটাকে নেড়ে চেড়ে দেখ্‌তে হয়, তার সম্বন্ধে নানা রকম পরীক্ষা কর্‌তে হয়। তুমি যদি বল গোপাল বাবু খুব ভাল লোক, তার মানে এই যে, তুমি অনেক দিন গোপাল বাবুর সঙ্গে মিশেছ, তাঁহাকে বেশ জান শোন, তাঁর কায কর্ম্ম ব্যবহার দেখেছ, তাঁকে পরীক্ষা করেছ, তবে বুঝেছ তিনি খুব ভাল। এইরূপ সতীশ ছেলেটী কেমন জান্‌তে হ'লে তার সঙ্গে মিশে তার কায কর্ম্ম ব্যবহার দেখা চাই, তাকে পরীক্ষা করা চাই তবে সে ভাল কি মন্দ, বোকা কি বুদ্ধিমান জানা যাবে। আম না চেখে দেখলে ভাল কি মন্দ টের পাওয়া যায় না। পরীক্ষাই প্রায় সকল জ্ঞানের মূল। পরীক্ষা ভাল করিয়া করিতে পারিলে সকলেরই গুণ টের পাওয়া যায় কেহই ফাঁকি দিয়া বড় বেহাই পাইতে পারেন না।

যারা অন্ধ তাদের কি কষ্ট। তাদের জীবনের অর্দ্ধেক সুখ অর্দ্ধেক আনন্দ চলে যায়। আমাদের চোখ আছে তাই বাহিরের কত সুন্দর সুন্দর শোভা দেখে কতই সুখ অনুভব করি। কিন্তু এই চোখ থেকেও আমরা অন্ধ হইতাম যদি আলো না থাকিত। অন্ধকারে চোখ থাক্‌লেই বা কি আর না থাক্‌লেই বা কি, সবই সমান, যদি আলো না থাকে।

আলো যখন এমন জিনিস, যা না থাক্‌লে চলে না, তার বিষয় কি কিছু জানা উচিত নয়?

আলোর বিষয় অনুসন্ধান করিলে সর্ব্বাগ্রে আমরা এই টের পাই যে, কতকগুলি বস্তু আলোককে বড় সম্মান ক'রে চলে, তাদের সামনে এলেই অমনি তারা যাবার পথ ছেড়ে দেয়, আলো তাদের ভিতর দিয়া নির্ব্বিঘ্নে চলে যায়। আবার অনেক ভায়া আছেন তাঁরা বড় একটা কেয়ার করেন না, আলো যদি সামনে এসে পড়ে তবে তাঁরা যেন বুক ফুলিয়ে দাঁড়ান, পথ ছেড়ে দেন না, বেচারা আলো সেইখানে থেকে যান, না হয় আবার ফিরে আসেন। কাচ, জল, বাতাস এরা প্রথম শ্রেণীর মধ্যে, আর ইঁট, পাথর, কাঠ, কাগজ, ধাতু ইত্যাদি দ্বিতীয় শ্রেণীর। প্রদীপের সম্মুখে কাচ ধরিলে তার ভিতর দিয়া আলো আসে। তাই দেখ কাচের সেজ, কাচের চিমনি, কাচের লণ্ঠন। জলের ভিতর দিয়া জলের তলায় কি আছে টের পাই। বাতাসের ত কথাই নাই। আমরা যখনই যা দেখি, সব বাতাসের ভিতর দিয়া। আবার দেয়ালের আড়ালে প্রদীপ রাখ দেয়াল ভেদ করিয়া আলো আসিবে না। ধামা দিয়া ঢাকিয়া রাখিলে প্রদীপ আর দেখ যায় না। চোখের সাম্‌নে তোমার স্লেটখানি ধর স্লেটের ওপাশে সম্মুখের বস্তু কিছুই দেখিতে পাইবে না। অর্থাৎ ইহারা আলোর পথ ছাড়িয়া দিল না। প্রথমগুলিকে স্বচ্ছ বলে, দ্বিতীয়গুলি অনচ্ছ।

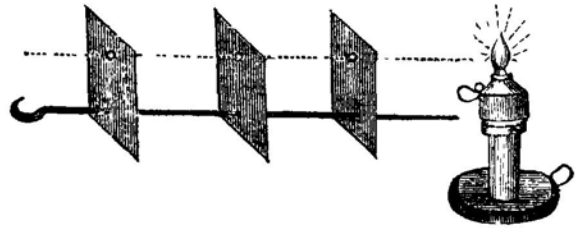
আলোর প্রথমগুণ এই জানা যায় যে আলো সোজা পথে চলে। কোনও বাধা না পড়িলে কখনও বাঁকা পথে যায় না। ইহার প্রমাণ কি? পরীক্ষা কর।

(ক) সোজা নলের ভিতর দিয়া দেখা যায়, বেঁকা নলের ভিতর দিয়া দেখা যায় না। কাগজের

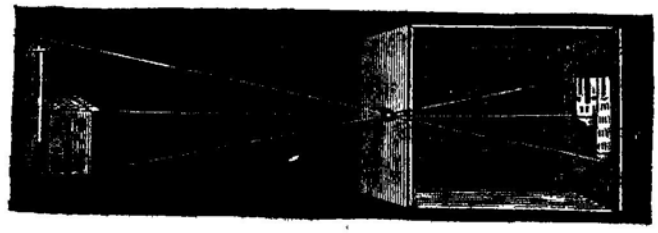
সোজা একটী চোঙ্গার ভিতর দিয়া যদি দেখ তবে চোঙ্গার ওপাশে যা আছে তা দেখতে পাবে। যদি চোঙ্গ মাঝা মাঝি বেঁকাও তবে কিছুই দেখিতে পাইবে না।

(খ) প্রদীপ ও চোখের মাঝে একখানি বই ধর প্রদীপটী দেখিতে পাইবে না। বইএর পাশ দিয়া ঘুরিয়া আসিয়া তোমার চক্ষে আলো পড়িল না।

(গ) একটী কাঁটার কাটীতে বা সোজা একটী লৌহ সলাকায় তিনখানি তাস বা ব্যবহৃত পোষ্ট-কার্ড ফাক্ ফাঁক্ করিয়া বিদ্ধ কর। আর একটী সলাকা এধার ওধার ফুঁড়িয়া তাস তিনটীর উপরে এক একটী করিয়া ছিদ্র কর। ছিদ্র তিনটীই এক সরল রেখায় হইবে। শেষের তাসের ছিদ্রের নিকট যদি একটী প্রদীপ রাখা যায় তবে সম্মুখের তাসের ছিদ্রের ভিতর দিয়া দেখিলে প্রদীপ দেখা যাইবে। কিন্তু কোন একখানি তাসকে ডান কিম্বা বাম দিকে ঈষৎ হেলাইয়া সরল রেখা হইতে বিচ্যুত করিলে আর ছিদ্রের ভিতর দিয়া আলো দেখা যাইবে না।

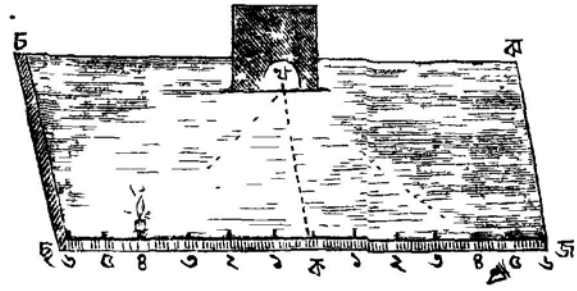


আলো সরল পথে যায় বলিয়া পদার্থের ছাঁয়া পড়ে। বন্দুক বা তীর ছুঁড়িবার সময়ে লক্ষ্য বা নিশানা করিতে পারা যায়। এই গুণ থাকাতেই নাবিকেরা জাহাজ চালাইতে সক্ষম হয়। এই গুণ থাকাতেই জ্যোতির্বিদ দূরবীক্ষণ যন্ত্র ব্যবহার করেন। এই গুণ থাকাতে একটী বড় মজা হয় দেখ্‌তে। যে ঘরের একটী দিক্ বেশ খোলা সেই ঘরের সমস্ত দরজা বন্ধ করে অন্ধকার হলে সেই খোলাদিগের দরজা বা জানালার কাছে গিয়া দেখ তাতে কোন ছিদ্র আছে কিনা, থাকেত ভালই, যদি না থাকে ত একটী ছিদ্র করে নাও। সেই ছিদ্রের কাছে যদি একখানি সাদা কাগজ ধর দেখবে যে সেই কাগজের উপর বাহিরের বস্তুর কেমন সুন্দর একটী উল্টা ছবি পড়িয়াছে। কাগজখানি যত সরাইবে ছবিটী তত বড় হইবে। হয়ত দেখিবে দেয়ালে একটী বড় উল্টা ছবি পড়িয়াছে। ছোট ছোট কাগজের বাক্সের পাশে একটী করিয়া যদি ছিদ্র করিয়া লও, তবে নানা জিনিসের ছবি সেই বাক্সের ভিতর দেখিতে পাবে। একটী দেশালাইয়ের বাক্সের খোলটীর



উপরে যেদিকে লেখা থাকে সেই দিকের মাঝখান একটী ছিদ্র করিয়া যদি লও আর কোন বাড়ী ঘর কি গাছ পালার দিকে যদি সেই ছিদ্রটী ফিরাও তবে পাশ দিয়া দেখিলে দেখিতে পাইবে যে অপর দিকে কেমন ক্ষুদ্র অথচ সুন্দর উল্টা ছবি পড়িয়াছে।

আলোর দ্বিতীয় গুণ এই টের পাবে যে, যখনই কোন মসৃণ পালিশ করা জিনিসের উপর আলো পড়ে তখনই সেখান হইতে ফিরিয়া যায়। নদী বা পুকুরের পারে দাঁড়াইলে জলে ওপারের গাছ পালার ছায়া পড়েছে দেখ্‌তে পাবে। একখানি *আর্শির সামনে যদি একটী প্রদীপ বা তোমার মুখ-* খানি ধর তবে আর্শিতে প্রদীপের বা তোমার মুখের ছবি দেখিতে পাবে। গাছপালা থেকে যে আলো, কিম্বা প্রদীপ বা তোমার মুখ থেকে যে আলো জল বা আর্শীর উপর প'ড়ে ছিল সেগুলি চলে যাবার পথে বাধা পেয়ে সেখান থেকে তোমার দিকে ফিরে এসে তোমার চখে পড়্‌ল তাই তুমি জল ও আর্শির ভিতর ছবি দেখিতে পেলে। এই ফিরে আসারও একটী নিয়ম আছে। সেটি এই:— আর্শির (বা যে কোন পালিশ করা জিনিস হউক) উপর আলো যত হেলে পড়ে সেই পড়িবার স্থান হইতে বিপরীত দিকে ফিরে যাবার সময়ে আর্শির দিকে ততটা হেলে যায়। ইহাকেই বৈজ্ঞানিক কথায় বলে "পতন কোন পরাবর্ত্তন কোনের সঙ্গে সমান হয়"। এটী সহজে পরীক্ষা করা যায়। বাজারে যে একপয়সা বা দুই পয়সা করে ছোট *ছোট আর্শি পাওয়া যায় তাহারই একখানি আর্শি* চছজঝ পুরু কার্ডবোর্ডের ঠিক মাঝখানে ছুরি দিয়া একটু চিরিয়া তাহার ভিতর বসাইয়া দাও। আর্শি-খানির মাঝখানে (খ) একটু ফাঁক রাখিয়া আর সব একটুকরা কাগজ দিয়া চাকিয়া দাও।




ছজ র ঠিক মাঝখানে (ক) একটী দাগ দাও। ক হইতে খ পর্য্যন্ত একটী সরলরেখা টান। রেখাটী যেন আর্শির উপর না হেলে থাকে, যেন সোজা হয়ে থাকে অর্থাৎ জ্যামিতিতে যাকে লম্ব বলে তাই যেন হয়। ছক ও জক কে কয়েকটী সমানভাগে বিভক্ত করিয়া দাগ দাও। ছক র এক এক ভাগ যেন জক র এক এক ভাগের সমান হয়। এখন দেখ যে ছক র কোন্ একভাগ যথাঃ চিহ্নের উপর যদি একটী ছোট বাতী বা অন্য কোন ক্ষুদ্র বস্তু রাখ তবে জক র দিগের ৪ চিহ্নের নিকট চোখ রাখিয়া যদি খ র দিকে তাকাও তবে আর্শির ভিতর তার ছবি দেখ্‌তে পাবে। কিন্তু চোখ যদি ২ এর কাছে বা ৬ এর কাছে আন তবে আর সে ছবি দেখ্‌তে পাবে না। আর ৪এর কাছে যদি চোখ থাকে তবে বাতীটী যদি ৫,৬,৩, বা ১ এর কাছে আন, আর তার ছবি দেখ্‌তে পাবে না। এ ধারে যে চিহ্নের-কাছে বাতী রাখিবে ওধারে ঠিক সেই চিহ্নের কাছে চোখ না লইয়া গেলে ছবি দেখা যাইবে না।

তাহার কারণ কি বুঝিলে,-এ ধারের ১, ৩ বা ৬ যে চিহ্ন হ'তে থ পর্য্যন্ত একটী সরলরেখা টানা যায় সে রেখাটী আর্শির উপর বা কথ র সহিত যতটা হেলে বা ঝুঁকে থাকে ও ধারে থ হ'তে ১, ৩ বা ৬ চিহ্ন পর্য্যন্ত এক সরলরেখা টানিলে সে রেখাটীও আর্শির উপর বা কথ র সহিত ওধারে ততটাই হেলে বা ঝুঁকে থাক্‌বে। অন্য কোন রেখা তা হবে না। সেই জন্য অন্য চিহ্ন হ'তে দেখা যায় না।

আবার জিনিসটী আর্শির সামনে যত দূরে থাকে তার ছবিটী আর্শির পিছনে ঠিক তত দূরে দেখায়।

দুখানি আর্শি যদি সাম্‌না সাম্‌নি কাত করিয়া লাগাইয়া রাখা যায়, আর তার মধ্যে যদি কোন জিনিস ধরা যায় তার অনেকগুলি ছবি পড়ে। যদি একটার উপর আর একটা ঠিক দাঁড় করাইয়া দেওয়া যায়, তবে তিনটি ছবি পড়ে। আরও বেশী কাত করিলে আরও অধিক ছবি পড়ে। ইহার কারণ এই যে দুখানি আর্শিতে ত দুটী ছবি পড়িবেই, তা ছাড়া ছবির ছবি তার ছবি এই দুইখানি আর্শিতে ক্রমাগত প্রতিবিম্বিত হইতে থাকে। বাজারে এক রকম খেলনা পাওয়া যায়; একটী কাগজের চোঙ্গার ভিতর দিয়া দেখিতে হয় আর চোঙ্গাটী ঘুরাইতে হয়, ইহাতে অনেক রকম রং-করা ছক্‌কাটা ফুল দেখিতে পাওয়া যায়।

এই চোঙ্গার ভিতর তিনখানি লম্বা কাঁচের টুকরা পরস্পর কাত করিয়া বসান থাকে। চোঙ্গার তলাটী গোল কাঁচ দিয়া বন্ধ করা, তার ভিতর কয়েকটী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রং করা কাঁচের টুকরা দেওয়া থাকে, সেইগুলি ঐ তিনখানি কাঁচ হইতে বারে বারে প্রতিবিম্বিত হয় বলিয়া নানা রকম ছক্‌কাটা সুন্দর সুন্দর ছবি দেখ্‌তে পাওয়া যায়।

দর্পন যদি চেপটা না হইয়া গোল কিম্বা চোঙ্গার মত হয় তবে ছবিগুলি বড় মজার বিকৃত হইয়া পড়ে। শিশি বোতল বা চক্‌চকে কাঁসার গেলাসে বা ঝক্‌ঝকে ঘটী বা কলসীর উপর তোমার মুখের ছবি দেখ। কেমন বিকৃত দেখাবে।

## নূতন-খেলা।*

এস এস ভাই আজ সকলে মিলিয়া,
খেলিব নূতন খেলা আমোদে মাতিয়া।
বড়ই সুন্দর-খেলা দেখিবে এখন,
কতই আমোদ পাব নূতন নূতন।
এক, দুই, তিন, চারি, ছয় জন করি,
গোল হ'য়ে দাঁড়াইব হাত ধরা ধরি!
ফুলে দলে সরোজেরে দিব সাজাইয়া,
ধূলা বালি সেজে রবে মাঝে দাঁড়াইয়া।
ছয় জনে ছয় ঋতু আমরা সাজিয়া,
নেচে নেচে চ'লে যাব ঘুরিয়া-ফিরিয়া।

তুমি ত হইবে গ্রীষ্ম ভাবনা কি তার!
পাগল বরষা হবে নলিনী আমার!
শরত হইবে শশী, আমি ত হেমন্ত!
যামিনী হইবে শীত, কামিনী বসন্ত!

এস তবে গোল হ'য়ে দাঁড়াই সবাই,
জোর ক'রে হাত তবে ধর সব ভাই!

* ইংরাজী রয়াল রিডার নামক পুস্তকের কোন একটী কবিতার ভাব অবলম্বন করায় এই কবিতাটী লিখিত হইল।

ঘুরিব সকলে যেন চক্রের মতন।
ঘন ঘন শ্বাস নাহি বহে যতক্ষণ।
যতক্ষণ গাল-দুটী না হইবে লাল,
ঘুরিব সে নেচে নেচে সবে তত কাল।

এস তবে এস ভাই দেবী কেন কর।
ঘুরে ঘুরে চল সবে হাত ধরে ধর!
এই চ'লে গেল গ্রীষ্ম, বরষা আসিল!
শরতের হাত ধরি হেমন্ত চলিল।
দেখিতে দেখিতে শীত হ'য়ে গেল অন্ত।
এই এল, চ'লে গেল, সাধের বসন্ত!

নিদাঘ, বরষা, আর শরত, হেমন্ত,
ফিরে ঘুরে আসে শীত লইয়া বসন্ত।
ছয় ঋতু চ'লে যায় নাচিয়া নাচিয়া!
নূতন বৎসর-মালা গলায় পরিয়া!



(প্রাপ্ত)

# বিলাসের শিক্ষা।

(বালকের রচনা।)

বিলাসচন্দ্র বড় লোকের সন্তান। বড় লোকের সন্তান হইলে সাধারণতঃ যে সমুদয় গুণ থাকে আমাদের বিলাস বাবুর তাহার কিছুরই অভাব ছিল না।

বিলাস ছেলে বেলা হইতেই অত্যন্ত আমোদের ও বিলাসিতার ক্রোড়ে লালিত পালিত হইয়া ধিঙ্গি হইয়াছেন। বয়স ১৫ বৎসর হইয়াছে। কিন্তু বিলাসের এপর্য্যন্ত পাঠশালা স্কুল বা কলেজের "ক" "খ" বা "এ" (*A*) "বি" (*B*) র সহিত আলাপ হয় নাই। শান্তিপুরের ১০৷৷০ টাকা বা ২০৲ টাকা দামের জোড়ার মিহি কাপড় পরেন। নানাপ্রকারের সার্ট, কামিজ, টাইট কোট, ইংলিশ কোট, চায়না কোট, পার্শিয়ান কোট, জর্ম্মান কোট, রাষিয়ান কোট, ইটালি কোট, আরবি কোট প্রভৃতি আকারান্ত ও ইকারান্ত কোট সমূহে তাঁহার চারিটী বাক্স পূর্ণ। রিমেলের ইউডিকলোন, ল্যাভেণ্ডার, পমেটম না হইলে তাঁর চুল ফেরান হয় না। সুগন্ধি নারিকেল তৈল (Perfumed rosy Cocoanut Oil) মাখেন। মণ্টিথের বাড়ীর জুতা পায় দেন। নানারূপ আতর মাখেন। হাতে এক গাছি সরু ভাল ছড়ি লইয়া কোঁচার ফুলটী সন্তর্পণে ধরিয়া চাদরটী বুকে জড়াইয়া ফুল কাটিয়া রুমালের অর্দ্ধেক খানি পকেট হইতে ঝুলাইয়া সুগন্ধে ভূষিত হইয়া বিলাস বাবু যখন হাটেন তখন বোধ হয় যেন কার্ত্তিক কলিতে ময়ূর হারা হইয়া বেড়াইতেছেন। এ সব দোষ ছাড়া বিলাসের আরও কয়েকটি দোষ আছে, বিলাস বড় অহঙ্কারী, বড় রাগী, এবং বড় রুক্ষ। যে কথা বলে তার উপরই চড়া চড়া কথা। বিলাস মনে করেন যে তাঁর ন্যায় দ্বিতীয় ব্যক্তি আর নাই। বিলাস কিন্তু নিজের পোষাকগুলি বড় ভাল বাসিত। পোষাক যাহাতে ময়লা না হয়, পোষাকে ধূলা কুটা না পড়ে, কেহ না নাড়ে এটী বিলাসের বড় ইচ্ছা। বিলাস বেড়াইয়া আসিয়া পোষাকগুলি ছাড়িয়া বেশ করিয়া ব্রস্ দিয়া ধূলা কুটা ঝাড়িয়া একটি পরিষ্কার আলনায় বন্ধ করিয়া রাখেন। কেহ তাহা না ছোঁয়,—না নাড়ে।

বিলাস একজনকে বড়ই ভালবাসিত। সে ফণীভূষণ বাবু। ফণী বাবু এবার বি, এ, ক্লাশে পড়েন। বিলাস তাঁহাকে বড় ভক্তি করে। তিনি মধ্যে মধ্যে আসিয়া বিলাসকে নানা উপদেশ দেন। কিন্তু তাহা ভস্মে ঘৃত নিক্ষেপের ন্যায় বিফল।

যাহা হউক একদিন ফণী বাবু গিয়া দেখিলেন যে, বিলাস তাহার এক সুট পোষাক সম্মুখে করিয়া কাঁদিতেছে। টেবিলের উপর কতকগুলি চক্, এক খান সাবান, কতকগুলি আমরুল শাক পড়িয়া আছে। ফণী বাবু দেখিয়া অবাক্।

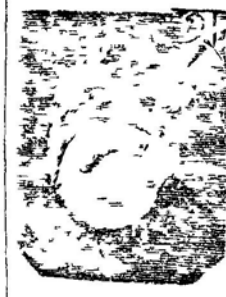
বিলাস বেড়াইয়া আসিয়া কাপড় ছাড়িয়া বাহিরে গিয়াছে এমন সময় তাহার ছোট ভগ্নী আসিয়া চেয়ারে বসিল। দুর্ভাগ্যক্রমে টেবিলে ইংরাজি কালীপূর্ণ একটী দোয়াত ছিল। চারি বৎসরের বালিকা কি জানে? সে বেশ রঙ্গীন দোয়াতটী দেখিয়া যেমন হাতে করিতে গিয়াছে অমনি কালীর দোয়াতটীর সমুদায় কালী বিলাসের রাঙ্গাপড় চাদর জামা প্রভৃতিতে লাগিয়া গেল। বালিকা দৌড়িয়া পলাইল। কিন্তু বিলাস আসিয়া যেই দেখিল যে তার সাধের পোষাকে কালী লাগিয়াছে তখন তার কান্না দেখে কে? অনেকক্ষণ কাঁদিয়া কাঁদিয়া শেষে এই সব সাবান, খড়ি, আমরুল শাক প্রভৃতি লইয়া ক্রমাগত অত্যন্ত আগ্রহ ও মনোযোগের সহিত ঘষিতেছে, কিন্তু সোড়া কালির দাগ কিছুতেই উঠিতেছে না। তাই সে নিরুপায় হইয়া কাঁদিতেছে। আর সময় সময় ঐ পোষাকের দিকে তাকাইতেছে। বিলাসের পোষাক অনেক আছে বটে, কিন্তু তাহলে কি হয়? তার পোষাকের প্রতি এতই মমতা যে সে এক সুট পোষাক নষ্ট হওয়া দেখিতে পারিতেছে না।

ফণী বাবু বিলাসকে অনেক বুঝাইয়া পরে অনেক কষ্টে পোষাকের কালীর দাগ উঠাইলেন; তখন বিলাসের আনন্দ দেখে কে? বিলাস আনন্দে নাচিতে লাগিল।

পরে ফণী বাবু গম্ভীরভাবে বলিলেন "দেখ বিলাস! তুমি এই সামান্য পোষাকের কালীর দাগ উঠাইতে যত কষ্ট করিলে ইহার পরিবর্ত্তে যদি তুমি তোমার অন্তরের কালী মুছাইতে চেষ্টা করিতে তবে বড় সুখের বিষয় হইত। দেখ তোমার অন্তরে কেমন দৃঢ় কালী পড়িয়াছে। তুমি লেখা পড়া কিছুই জান না। তুমি বিনয়ীর পরিবর্ত্তে অহঙ্কারী, বিদ্বানের পরিবর্ত্তে মূর্খ এবং ক্রোধ সংযমীর পরিবর্ত্তে ক্রোধী হইয়াছ। দীনে দয়া, পরোপকার, জীবে কষ্ট না দেওয়া প্রভৃতি সৎগুণগুলি তোমার অন্তর হইতে বিদূরিত হইয়াছে, কেবল তুমি অত্যন্ত বিলাসী, অহঙ্কারী, দম্ভী হইয়াছ। বল দেখি বিলাস! এগুলি কি অন্তরের কালী নয়? দেখ দেখি প্রত্যেক লোকে তোমাকে নিন্দা করে। কেহই তোমাকে ভালবাসে না! সকলেই তোমাকে বিষ নয়নে দেখে? বল দেখি এত লোক থাকিতে লোকে তোমাকেই এরূপ করে কেন? তোমার খুড়্তুতো ভাই দেবেন্দ্রকে তো কেহই এমন বলে না। সকলেই তাকে আদর করে, ভালবাসে, প্রশংসা করে! কেন বল দেখি? এ আর কিছুই নয়। এ কেবল তোমার অন্তরের কালীর জন্য! দেবেন্দ্র দেখ তোমাপেক্ষা ছোট, সে এবার এণ্ট্রেন্স পরীক্ষা দিবে। আর তুমি কিছুই জান না? কথায় বলে যে 'ভালবাসা চাও যদি নিজে ভাল হও।' অতএব তুমি আজ হইতে এসব বিলাসিতা ত্যাগ কর। বিদ্যা ও সৎগুণে দেহ ভূষিত কর। বিদ্যা ও সৎগুণের ন্যায় পোষাক জগতে নাই। ঈশ্বরকে ভক্তি

কর। কুকাজ করিয়া তাঁহার আজ্ঞা অবহেলা করিও না! দেখিবে তোমার মন প্রফুল্ল হইবে। তখন তুমি মনে এত সুখ পাইবে যাহা বলিবার নহে। অতএব ভাই। মনের কালী দূর কর। মন স্থির করিয়া যাহাতে বিদ্যা, বিনয়, পরোপকার, দয়া ইত্যাদি সদগুণ উপার্জ্জন করিতে পার তাহার চেষ্টা কর। প্রত্যহ দৈনিক কাজ তত্ত্বাবধান করিয়া দেখিও কোন রূপ কুকাজরূপ ধূলা কুটা পড়িয়াছে কি না, যদি প'ড়ে থাকে, বেশ করিয়া ঝাড়িয়া পরিষ্কার করিবে আর সতর্ক হইবে যেন আর সেরূপ না হয়। যদি কোন ব্যক্তিকে মারিতে চাও তবে মনে করিবে যে, যদি কেহ তোমাকে মারে তবে তাহা তুমি ভাল বোধ কর কি না। অবশ্যই করিবে না' অতএব অপরকেও মারিও না বা কষ্ট দিও না। কোন অসৎ প্রবৃত্তি বা অসৎ অভিপ্রায় মনে উদয় হইবামাত্র পিতা মাতা আদি গুরুজনের নিকট বা যেখানে সৎ কথার আলোচনা হইতেছে তথায় যাইবে। অসৎ বালকগণের সঙ্গ বা অসৎ পুস্তক পাঠ পরিত্যাগ করিবে। প্রতিদিন ঈশ্বরের নিকট সৎ-প্রবৃত্তির জন্য প্রার্থনা করিবে। আজ এই পর্য্যন্ত। যদি দেখিতে পাই তুমি এই কথা মানিয়া চলিতেছ, তবে আর এক দিন তোমাকে আবার উপদেশ দিব। দেখিও যেন ভুলিও না।" বিলাস কথাগুলি নীরবে শুনিল, এবং মনে মনে বুঝিল। এবং তার পরদিন হইতে বিলাস রীতিমত বিদ্যালয়ে গিয়া পাঠাদি আরম্ভ করিল ও বিলাসিতা পরিত্যাগ করিল। বিলাস আর অসৎ সঙ্গে যায় না। এক বৎসরের মধ্যে বিলাস মাইনর পরীক্ষা দিয়া প্রথম হইয়া বৃত্তি পাইল। এবং এখন বিলাসের চরিত্র বেশ ভাল হইয়াছে। গ্রামে এখন বিলাসের বড় প্রশংসা হইয়াছে।

# মামথ।



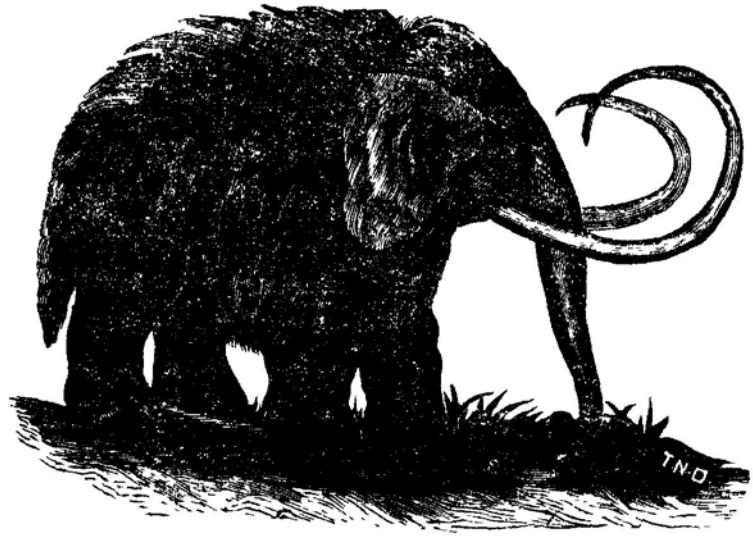
জ তুমি যত বড় হইয়াছ, পাঁচ বছর পূর্ব্বে আর কিছু তুমি এত বড় ছিলে না। এমন সময় ছিল যখন তুমি চলিতে পারিতে না, কথাটী ও কহিতে পারিতে না, তখন তোমার সম্বল ছিল কেবল মার ক্রন্দন। তার পর ক্রমে তুমি হাত পা নাড়িতে আরম্ভ করিলে, ক্রমে তোমার মুখে কথা ফুটিল, তুমি দু এক পা চলিতে শিখিলে। আরও দুই চার বছর গেল, তুমি ও ক্রমে বাড়িতে লাগিলে, ক্রমে দশ জনের একজন হইয়া উঠিলে। এ সব হইল বটে কিন্তু তোমার সেই বাল্যকালের সম্বল—ক্রন্দনটী কিন্তু তুমি ছাড়িলে না। যখন তোমার আর কোন উপায় না ছিল, তখন ক্রন্দন তোমার সম্বল করিয়া দেওয়া হইয়াছিল। কিন্তু তোমার যখন ক্রমে সব হইল, তখনও তুমি কেন ওটী ছাড়িলে না? এখনও তুমি একটুতেই মুখ ভার করিয়া নাক ফুলাইয়া কাঁদিতে বস। কিন্তু সে কথা যাক্, যাহা কেহই ছাড়িতে পারিল না, তাহার জন্য তোমাকেই বা কেন দোষ দি, আর বুঝি ইহা কেহই ছাড়িতে পারে না—মানুষ ভূমিষ্ঠ হইয়া কাঁদিতে আরম্ভ করে, আর যে দিন এসংসার পরিত্যাগ করিয়া যায় সেই দিন তাহার ক্রন্দনের শেষ হয়।

যাহা হউক বলিতেছিলাম যে, আজ তুমি যত বড় হইয়াছ, চিরকালই কিছু তুমি এত বড় ছিলে না। আজ পৃথিবীকে যে অবস্থায় দেখিতেছ

পৃথিবীও চিরকাল এমনতর ছিল না। তুমি যেমন এক সময় শিশু ছিলে, পৃথিবীও তেমনি এক সময় শিশু ছিল। তোমার যেমন শৈশব, বাল্য, কৈশোর গিয়াছে, যৌবনে পদার্পণ করিয়াছ; পৃথিবীরও তেমনি শৈশব, বাল্য, কৈশোর গিয়াছে,—মনে হয় যেন পৃথিবীও যৌবনে পদার্পণ করিয়াছে। আজ পৃথিবী সুজলা, সুফলা, শ্যামলা। বৃক্ষ, লতা, তৃণ, গুল্ম আজ পৃথিবীর অপূর্ব্ব-শোভা, বৃক্ষলতা আজ ফুল ফলে পরিপূর্ণ, কুসুমের সৌরভে চারিদিক আমোদিত। কিন্তু আজ যাহা দেখিতেছ, চিরদিন ইহা ছিল না—থাকিবেও না। কাল তুমি যাহা ছিলে, আজ আর তুমি তাহা নও কালকার সে তুমি—আর আজকার তুমি নও, কালকার তুমি ছিলে একজন, আর আজকার তুমি আর একজন, প্রতিমুহূর্ত্তেই তাহার পরিবর্ত্তন হইতেছে। পৃথিবীরও তাহাই। কালকার পৃথিবী যাহা ছিল, আজ আর তাহা নাই, প্রতিদিন—প্রতিমুহূর্ত্তে তাহার পরিবর্ত্তন হইতেছে। এ সকল কবিত্বের কথা নহে, বিজ্ঞানের কথা। তত্ত্ববিদেরা পরীক্ষা ও অনুসন্ধান করিয়া জানিতে পারিয়াছেন যে, এই যে সুজলা, সুফলা, শ্যামলা, মানুষের বাসের উপযোগী পৃথিবী আজ আমরা দেখিতেছি, চিরদিন ইহা এ প্রকার ছিল না। এই পৃথিবীর এমন সময় ছিল, যে সময় এ সকল কিছুই ছিল না। প্রথমে পৃথিবী তরল অগ্নিময় অবস্থায় ছিল। কালক্রমে ইহার উপরে, অথবা বাহিরের দিক্‌টা শীতল হইয়া ক্রমে কঠিন আকার ধারণ করিল। উপরে একটা কঠিন আবরণ হইল বটে, কিন্তু ভিতরে সেই প্রকার তরল অগ্নিময় অবস্থাই রহিয়া গেল। আগ্নেয়গিরি বা জ্বালাভূমি, উষ্ণপ্রস্রবণ, ভূমিকম্প প্রভৃতি তাহার প্রমাণ। ক্রমে এই কঠিন আবরণের উপরে চারিদিকের ভিন্ন ভিন্ন বায়বীয় পদার্থের মিশ্রণে জলের উৎপত্তি হইল। একটা কথা বলিতে ভুলিয়াছি। পৃথিবীর উপরের আবরণ যখন ক্রমে কঠিন হইতে লাগিল, তখন সকল স্থান সমান উচ্চ হয় নাই, কোনও স্থান উচ্চ কোনও স্থান নিম্ন হইয়া গিয়াছিল, এই সকল স্থানে জল দাঁড়াইল। যে কঠিন আবরণের কথা বলিয়াছি, তাহা কিন্তু মৃত্তিকা নহে, তখনও মৃত্তিকার জন্ম হয় নাই, পর্ব্বতের ন্যায় একটা কঠিন আবরণ মাত্র। সুতরাং তখন পৃথিবীতে কেবল জল ও পর্ব্বত, পর্ব্বত ও জল। ভূতত্ত্ববিদেরা এই কঠিন আবরণকে "আদি শৈল" নাম দিয়াছেন। এই আদি শৈলের অধিকাংশই মাটি হইয়া গিয়াছে কিন্তু এক আদি শৈল হইতেই মৃত্তিকার জন্ম হয় নাই, তাহা পরে বলিব। আদি শৈল হইতে মৃত্তিকার জন্ম হইয়াছে, আবার কালবশে মাটি হইতে আবার পাহাড় হইয়াছে, আবার এই পাহাড়ের মধ্যেও কতক আবার মাটি হইয়া গিয়াছে। পর্ব্বতময় দেশে যাঁহারা থাকেন, তাঁহারা দেখিয়াছেন, মাটি কেমন করিয়া পাথর হয়, আবার পাথর কেমন করিয়া মাটি হয়।

আদি শৈল হইতে মৃত্তিকা হইল, তাহাতে ক্রমে উদ্ভিদের জন্ম হইল, কিন্তু সে সময়ের উদ্ভিদের সহিত এখনকার ফল ফুলে শোভিত বৃক্ষলতার কোন সাদৃশ্য নাই, এখন আর তাহা পাওয়া যায় না, তবে ভূতত্ত্ববিদেরা অনুসন্ধান করিয়া তাহারও আকার জানিতে পারিয়াছেন। এখন পর্য্যন্ত পৃথিবীতে কোন প্রাণীর চিহ্ন নাই। ক্রমে জীবন বিশিষ্ট প্রাণীর জন্ম হইল; কিন্তু এখন যে সমস্ত জীবিত প্রাণী—যে সকল জীবজন্তু দেখিতেছ, এ প্রকার প্রাণী তখন ছিল না। কারণ পৃথিবীর তখনকার অবস্থায় এখনকার জীব বাস করিতে পারিত না; সেই সময়ের উপযোগী

জীবের তখন সৃষ্টি হইয়াছিল। কিন্তু প্রথমেই বলিয়াছি পৃথিবীর অবস্থার প্রতিদিনই পরিবর্ত্তন হইতেছে; ক্রমে সে সকল জীব জন্তুর মৃত্যু হইল। এই জীব জন্তুর দেহও সেই সময়ের উদ্ভিদে মিলিত হইয়া মাটির স্তর নির্ম্মিত হইল। এই নূতন রকমের মাটিতে আবার নূতন প্রকারের গাছ পালা অঙ্কুরিত হইতে লাগিল, নূতন প্রকারের জীব পৃথিবীতে দেখা দিল। এইরূপে নানাপ্রকার উদ্ভিদ ও নানা জাতীয় জীবের দেহ আদিশৈলের সহিত লক্ষ লক্ষ শতাব্দী ধরিয়া মিশ্রিত হইয়া এখনকার মৃত্তিকার জন্ম হইয়াছে এবং মানুষ ও এখনকার অন্যান্য জীব জন্তুর বাসের উপযোগী হইয়াছে। পণ্ডিতেরা অনুসন্ধান করিয়া পৃথিবীর ইতিহাসকে চারি যুগে ভাগ করিয়াছেন। প্রথম মৎস্যযুগ, কারণ তখন কেবল চারিদিকে জলে পরিপূর্ণ। আমাদের পুরাণেও কথিত আছে যে বিষ্ণু এই যুগে মৎস্যরূপে অবতীর্ণ হন। দ্বিতীয়যুগ সরীসৃপ প্রধান, এই যুগে পৃথিবীর অবস্থা পরিবর্ত্তিত হইয়া মৎস্য অপেক্ষা সরীসৃপেরই অধিক বাসের উপযোগী হইয়াছিল; এই সময়ের সরীসৃপ



অতি প্রকাণ্ড ও অদ্ভুত আকারের। পুরাণে এযুগে বিষ্ণুর কূর্ম্ম অবতার লিখিত আছে। কূর্ম্ম সরীসৃপ জাতীয়। তারপর তৃতীয়যুগে স্তন্যপায়ী ও স্থূলচর্ম্ম বিশিষ্ট জীবই প্রধান, যেমন হস্তী, মহিষ, বরাহ ইত্যাদি। কিন্তু সে সময়ের হস্তী, মহিষ ও বরাহ প্রভৃতি, এখনকার হস্তী প্রভৃতির মত ছিল না; তাহার আকার অতি প্রকাণ্ড এবং অদ্ভুত ছিল। এই যুগে মামথের সৃষ্টি হয় (ছবি দেখ), আমরা সেই মামথের কথাই বলিতে এতগুলি কথা বলিলাম। পণ্ডিতেরা সর্ব্বশেষ যুগকে, মনুষ্যযুগ, বলিয়াছেন, কারণ পৃথিবীর এখনকার অবস্থা মনুষ্যেরই বাসের বিশেষ উপযোগী এবং মনুষ্যই এখনকার প্রধান জীব। পৃথিবীর যে আর পরিবর্ত্তন হইবে না বা হইতেছে না, তাহা মনে করিও না। প্রতিমুহূর্ত্তেই ইহার পরিবর্ত্তন হইতেছে। ইহার পর কি যুগ আসিবে, এবং তখন পৃথিবী কি প্রকার প্রাণীরই বা বাসস্থান হইবে—কে জানে? পৃথিবীর অবস্থার পরিবর্ত্তনের সঙ্গে, ক্রমে পৃথিবীবাসী

জীবেরও পরিবর্ত্তন হইবে, তখন হয়ত কিম্ভূত কিমাকার এক প্রকার প্রাণী পৃথিবীর প্রধান জীব হইবে। মানুষ হয়ত তখন পৃথিবী হইতে লুপ্ত হইয়া যাইবে।

মামথের বিষয় লিখিতে গিয়া আমরা অনেক অন্য কথা বলিলাম। এবার আমরা মামথের বিষয় আর কিছু বলিব না—আগামী বারে যাহা হয় বলিব। এবারে যাহা বলা হইয়াছে, তাহাও পাঠক পাঠিকাদিগের উপকারে আসিবে এই মনে করিয়াই বলিলাম।

ক্রমশঃ।

# কৃপণ।

হুগলী জেলার অন্তঃপাতী কোন একটী ক্ষুদ্র গ্রামে রসিক কৃষ্ণ দত্ত নামে এক জন লোক বাস করিতেন। এ বহু দিনের কথা। তাঁহার অবস্থা অতি হীন ছিল, এমন কি দুই বেলা আহারের সংস্থানও হইত না। চাকুরীর কোন প্রকার সুবিধা করিতে না পারিয়া এইরূপ কষ্টে কিছু দিন কাটাইয়া রসিক কৃষ্ণ সেই গ্রামের এক জন মহাজনের নিকট হইতে ১০৲ দশ টাকা ধার করিলেন ও গ্রামে একটি ছোট মনোহারীর দোকান দিলেন।

রসিক কৃষ্ণের যত্নে এবং পরিশ্রমে দোকানের উন্নতি দিন দিন দেখা দিতে লাগিল। এই সামান্য দোকান ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হইয়া কলিকাতার বড় বাজারে স্থানান্তরিত হইল। শেষে গঙ্গার পারে একটী বড় বাড়ীতে যাঁহারা এই দোকান দেখিয়াছেন তাঁহারাই আশ্চর্য্যান্বিত হইয়াছেন। এত সামান্য অবস্থা হইতে এতদূর উন্নতি কিরূপ হইতে পারে, এই দোকানের অবস্থা দেখিয়াও অনেকেই বিশ্বাস করিতেন না। রসিক কৃষ্ণ এখন এক জন বড় লোক। তাঁহার আপীসে, ৫০। ৬০ জন কেরাণী খাটিতেছে, দরজার সাম্‌নে ২ জন দারওয়ান বসিয়া আছে, আপীস ঘরে অনবরত পাখা চলিতেছে। দশ টাকা মূলধন লইয়া কারবার আরম্ভ করিয়া এখন প্রায় দুই লক্ষ টাকা মূলধন হইয়াছে। মাসে প্রায় ৩। ৪০০০৲ টাকা আয় হইতেছে। এক দিকে তিনি যেমন এত টাকা উপার্জ্জন করিতে লাগিলেন অন্যদিকে তিনি আবার ঠিক এত টাকা পরের দুঃখ মোচনের জন্য খরচও করিতে লাগিলেন। যদিও এখন তিনি ফিটনে চড়িয়া আপীসে যান, ও আপীস হইতে চেরিয়াট হাকাইয়া বাড়ী যান তথাপি তাঁহার মনে কোনরূপ অহঙ্কার হয় নাই। ছেলে বেলায় তিনি যেরূপ কষ্টে দিন কাটাইয়াছেন সেই কষ্ট এখনও তাহার মনে রহিয়াছে।

বাড়ীতে ৪০। ৫০ জন গরীব ছেলে রাখিয়া বিদ্যা শিক্ষা দিতে লাগিলেন। গরীব দুঃখী বাড়ীতে আসিলে নিজে থাকিয়া তাহাদের যত্নের সহিত আহারাদি করাইয়া কাপড় পরাইয়া বাড়ী হইতে বিদায় দিতেন। নিজ গ্রামে একটী ফ্রি এণ্ট্রান্স স্কুল এবং একটী দাতব্য চিকিৎসালয় খুলিয়া দিলেন। এই দুইটীতে মাসে প্রায় ৪০০। ৫০০৲ টাকা অকাতরে দিতে লাগিলেন। একদিকে যেমন অনেক অর্থ ব্যয় করিয়া গরীব ছেলেদের বিদ্যা শিক্ষা ও গ্রামস্থ লোকদের বিনামূল্যে ব্যারাম চিকিৎসার বন্দোবস্ত করিয়া দিলেন অপর দিকে যাহাতে তাহাদের ধর্ম্মে

মতি থাকে, তাহারও ব্যবস্থা করিয়া দিলেন। গ্রামে ধর্ম্ম-চর্চ্চার জন্য একটী দেব-মন্দির সংস্থাপন করিয়া দিলেন। নিজ বাড়ীতে গ্রামের লোক সহ মিলিত হইয়া বার মাস ধর্ম্মের চর্চ্চা করিতেন। এই সমুদায় গুণে বসিক কৃষ্ণ গ্রামে সকলের পিতৃ তুল্য হইলেন। তাঁহার এক মাত্র ছেলে রামদাস বাবু এম, এ, পাশ দিয়াছেন। রামদাস বাবুর পাশ হইবার কিছু দিন পরেই সকলকে কান্দাইয়া বসিক বাবু বৃদ্ধ বয়সে এই সংসার হইতে জন্মের মত বিদায় গ্রহণ করিলেন।

রামদাস বাবু একেলে লোক। তাঁহার কাররার করা ছোট লোকের কাজ বলিয়া মনে হইল। তিনি উপযুক্ত লেখা পড়া শিখিয়াছিলেন তাঁহার চাকুরী করাই কর্ত্তব্য, তাঁহার পিতা লেখা পড়া শিখেন নাই, কাজেই তিনি দোকান করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিয়া গিয়াছেন। এইরূপ সিদ্ধান্ত করিয়া তিনি পিতার সমুদায় দোকান পত্র Mackenzie, Lyall & Co. মেকেঞ্জী লায়েল কোম্পানি নিলাম ওয়ালার দ্বারা বিক্রী করিয়া ফেলিলেন। বিক্রী করিয়া যে টাকা পাইলেন তাহাদ্বারা কোম্পানির কাগজ ক্রয় করিলেন। গ্রামের ফ্রি স্কুল ও দাতব্য চিকিৎসালয় উঠাইয়া দিলেন। দেব-মন্দিরের মাসিক আর্থিক সাহায্য বন্দ করিয়া দিলেন। যে সমুদায় নিঃস্ব গরীব সন্তান তাঁহার পিতার দ্বারা পালিত ও শিক্ষিত হইতেছিল তাহাদিগকে বিদায় করিয়া দিলেন। গ্রামে হুলস্থুল পড়িয়া গেল। সকলেই হাহাকার করিতে লাগিল। রামদাস বাবু এইরূপে সমুদায় খরচ কমাইয়া নিজে সাহেবদের খোসামুদ করিয়া একটী ডিপুটীগিরি পাইলেন। যাঁহার পিতার আপীসে কত সাহেব, বাঙ্গালী চাকর হইবার জন্য সর্ব্বদা ঘুরিয়া বেড়াইত, তাঁহারই ছেলে আজ নিজ বুদ্ধি-গুণে পরের নিকট চাকুরীর জন্য উমেদার। নিজের নামে যে কোম্পানীর কাগজ ব্যাঙ্কে জমা করিয়াছেন তাহার বার্ষিক সুদ ৮০০০৲ টাকা তত্রাচ চাকুরীর প্রার্থী। চাকুরী না করিলে মান থাকে না, এই জন্যই রামদাস বাবু কাররার তুলিয়া দিয়া চাকুরী লইলেন। মাহিয়ানা ৪০০৲ পর্য্যন্ত হইল। ৪০০৲ মাহিয়ানা হইল, ৪০৲ টাকা মাসিক খরচের বরাদ্দ করিয়া বাকী টাকা ব্যাঙ্কে মাসে মাসে জমাইতে লাগিলেন।

একমাত্র বিধবা ভগ্নী ছেলেপেলে লইয়া নিজ বাড়ীতে না খেতে পেয়ে মরিতেছেন, গুণবান দাদার সে দিকে মাত্র দৃষ্টি নাই। কেহ এ কথা উত্থাপন করিলে তাহার উপর খড়্গহস্ত হন, বলেন "আমি কোথায় টাকা পাইব? যাহারা গরীব তাহারা গরীব ভাবেই থাকিবে, তাহাদের বেশী আশা করা অন্যায়।" যে পিতার প্রসাদে তিনি আজ এত বড় বিষয়ের অধিকারী, যাহার জন্য তিনি আজ ৮০০০৲ টাকা বার্ষিক সুদ পাইতেছেন, তাহারই নাম একবারও মুখ দিয়া বাহির হয় না। দুই পয়সা খরচ হইবে এই ভয়েই তিনি বার্ষিক শ্রাদ্ধটা পর্য্যন্ত করেন না। গ্রামের লোকের উপরও ভারী চটা—গ্রামের লোকের নাম শুনিলেই তেলে বেগুণে জ্বলিয়া উঠেন। রাগের কারণ এই যে, গ্রামস্থ লোক তাঁহার নিকট হইতে স্কুল ও চিকিৎসালয় এবং অন্যান্য সাধারণ হিতকর কার্য্যের জন্য সময়ে সময়ে সাহায্য প্রার্থনা করে।

স্কুল ও চিকিৎসালয়ের চাঁদার জন্য কতিপয় উৎসাহী যুবক একবার তাঁহার নিকট উপস্থিত হওয়াতে তিনি টাকা দিতে অস্বীকার করিলেন। বলিলেন "স্কুলে টাকা দেওয়া অপব্যয়; কেন না দেশে স্কুল থাকিলে যত ছোট লোক লেখা পড়া শিখিয়া তাহাদের স্ব স্ব ব্যবসায়ের প্রতি ঘৃণা

প্রদর্শন করিবে এবং এই জন্যই শেষে জিনিষ পত্র সমুদায় মহার্ঘ্য হইয়া উঠিবে। এখন যে চাউল /৫ করিয়া সের কিনিতেছি তখন তাহা ৵০ করিয়া সের কিনিতে হইবে। সুতরাং যে কার্য্যে ভবিষ্যতে ঠকিতে হয় তাহাতে হস্তক্ষেপ করা বুদ্ধিমানের কার্য্য নয়।" আর একদিন কথায় কথায় বলিলেন যে "খাওয়া দাওয়ার জন্য, শরীর পুষ্টির জন্য বেশী পয়সা খরচ করা মূর্খের কাজ, কেন না ছয় মাস কি ১ বৎসর খাইয়া যে টুকু তোমার শরীর পুষ্ট হইবে ২ দিন জ্বরে ভুগিলেই আবার যেরূপ ছিলে সেই হইবে। সুতরাং এত টাকা যে খরচ হইল তাহার কিছুই উপকার হইল না। অপর পক্ষে এই টাকা বেঙ্গল ব্যাঙ্কে জমা করিয়া কোম্পানির কাগজ করিলে মাসিক কিছু আয় হইত।" একবার একমাত্র পুত্রের ওলাউঠা ব্যারামের সংবাদ টেলিগ্রাফে পাইয়া চাকুরী-স্থান হইতে পুত্রকে দেখিবার জন্য গ্রামে উপস্থিত হইলেন। পুত্রের অবস্থা বড়ই খারাপ, তত্রাচ বিনা পয়সার চিকিৎসারই ব্যবস্থা হইল। হুগলী হইতে ভাল ডাক্তার আনাইয়া চিকিৎসা করিবার কল্পনাও করিলেন না। দুই এক জন এ বিষয়ে পরামর্শ দিলে তিনি বলিলেন "বাঁচা মরা পরমেশ্বরের হাত। অদৃষ্টে থাকিলে বাঁচিবে আর তাহা না থাকিলে নিশ্চয়ই মরিবে, এজন্য অনর্থক ডাক্তারকে এত পয়সা দেওয়া অপব্যয়"। পরমেশ্বরের ইচ্ছায় সে বার পুত্র ব্যারাম হইতে উদ্ধার হইল। রামদাস বাবু গ্রামের লোকের উপর ভারী চটা, দুই চারি বৎসর অন্তর নিজ গ্রামে যাইতেন বটে, কিন্তু কাহারও সহিত মিল নাই। বাড়ী গিয়া নিজের জিনিষ পত্র সমুদায় গুছাইয়া আহারাদি করিতে অনেক খরচ পড়ে এই জন্য পরের বাড়ীতে কোন বেলা শুধু চা'ল এবং কাচকলা পাঠাইয়া দিয়া বলিতেন যে "কাচকলা ভাতে ভাত হইলেই আমাদের চলিবে", আর কোন দিন বা চা'ল এবং কিছু ডা'ল পাঠাইয়া বলিয়া পাঠাইতেন যে "শুধু ভাত ও ডা'ল হইলেই চলিবে" এইরূপ ১২ দিন কাটাইয়া কর্ম্মস্থানে চলিয়া যাইতেন। ॥৵০ হাতে হইলেই আর ।৵০ কর্জ্জ করিয়া ১৲ পুরাইয়া ব্যাঙ্কে জমা করিয়া রাখেন। একটী পয়সাও বিনা সুদে পড়িয়া থাকিবার যো নাই। শরীরকে এইরূপে কষ্ট দিতে দিতে এবং চাকুরী স্থানের হাড় ভাঙ্গা খাটুনির দরুণ তাঁহার যক্ষ্মা রোগের সূচনা হইল। দেখিতে দেখিতে ক্রমশঃ ব্যারাম শক্ত হইয়া উঠিল। মাজিষ্ট্রেট সাহেব ছুটির জন্য দরখাস্ত করিতে বলিলেন, কিন্তু তিনি মাহিয়ানার টাকার মমতা ছাড়িতে পারিলেন না। চাকুরী করিতে লাগিলেন। ব্যারামের চিকিৎসার জন্য ডাক্তারের পরামর্শ লইলেন না। ডাক্তারের ভিজিট দিতে হইবে এই ভয়ে ডাক্তার ডাকিলেনও না। দেখিতে দেখিতে তিনি সকলকে দুঃখ সাগরে ভাসাইয়া এ সংসার হইতে বিদায় গ্রহণ করিলেন। মরিবার সময়ে প্রায় ৫ লক্ষ টাকা রাখিয়া মরিলেন। রামদাসের মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্রও পিতার মত টাকা সঞ্চয় করিতে লাগিল।

এই কৃপণের সংক্ষিপ্ত জীবনী পাঠ করিয়া আমরা যদি বিশেষ মনোযোগের সহিত চিন্তা করি তবে বুঝিতে পারি যে, বঙ্গদেশে এইরূপ বোকা রামদাসের সংখ্যাই বেশী। কেহ বা কিছু বেশী কেহ বা কিছু কম রকমের। যে কিছু টাকা ঘরে থাকিবে তাহা দিয়া কোম্পানির কাগজ কিনিবার অথবা মাটির নীচে পুতিয়া রাখিবার এবং পরের গোলামী করার ইচ্ছা অধিকাংশ লোকেরই দেখিতে পাওয়া যায়।

কি কুক্ষণে যে কোম্পানির কাগজ সৃষ্টি হইল তাহা আর বলা যায় না। ইহার সুদের উপরই

সকলের ঝোঁক। ইংরাজেরা নিজ দেশ হইতে এক ছড়ি হাতে করিয়া আসিয়া এখানে সংবাদ পত্রে এক বিজ্ঞাপন দিলেন যে "আমি অমুক ব্যবসা করিবার জন্য একটা হাউস খুলিব, ১০০০,০০৲ মূলধন চাই" অমনি ১০।১৫ জন যাইয়া তাঁহাকে টাকা দিবার জন্য প্রার্থী হইলেন।

সাহেব বিনা কষ্টে টাকা পাইয়া ব্যবসায় খুলিয়া দিলেন, চৌরঙ্গীতে ৪০০। ৫০০৲ টাকার ভাড়াটীয়া বাড়ীতে বাসা করিলেন, প্রকাণ্ড বাড়ীতে অপীস করিলেন, ২০০। ৩০০ কেরাণী রাখিলেন, গাড়ী ঘোড়া করিলেন। সমুদায়ই পরের টাকা দিয়া। ক্রমে ব্যবসার শ্রীবৃদ্ধি করিয়া শেষে ১০। ১৫ লক্ষ টাকা লইয়া দেশে চলিয়া গেলেন। এইরূপই এখানের অবস্থা। বাঙ্গালী বাবু টাকা দেন, সমস্ত কাজ কর্ম্ম করেন, আপীসের লেখা পড়ার কাজ করেন আর সাহেবেরা মজা করিয়া লাভের সমুদায় টাকা গুলি লইয়া যান। যাহার টাকা সে বাবুটীর ছেঁড়া ইজের এবং চাপকান আর ঠনঠনীর কম্প জুতা কিন্তু ঘুচিল না। বাড়ী হইতে দুই প্রহরের রৌদ্রের সময়ে হাঁটিয়া আপীসে যাওয়া এবং সন্ধ্যার সময় হাঁপাইতে হাঁপাইতে বাড়ী আসা ইহারও কিছুই পরিবর্ত্তন হইল না।

এখানকার বড় বড় দোকানের কার্য্যাধ্যক্ষেরা সময়ে সময়ে ছোট লাট ও বড় লাট সাহেবের মন্ত্রী সভার সভ্য, মিউনিসিপালিটীর কমিসনর ও পোর্ট কমিসনর হইয়া থাকেন। আমাদের দেশে আসিয়া আমাদের নিকট হইতে টাকা লইয়া দোকান করিয়া টাকা উপার্জ্জন করিতেছে আর আইন সভার সভ্য হইয়া আবার আমাদেরই শাসন করিবার জন্য আইন করিতেছে। আমাদের দেশের এই অবস্থা!

# পথের ছবি।

নরেন্দ্রপুর গ্রামের পথ।

যাদব, মাধব ও নিতাই।

মাধব। কিহে যাদব এত ব্যস্ত হ'য়ে কোথা চল্লেছ?

যাদব। আরে তুমি ঘুমিয়ে থাক না কি, আজ যে নরেন্দ্রপুরের মেলা, তা কি তুমি জান না?

মাধব। ওহো, আমি সেটা ভুলেই গিয়েছিলাম, নিতাই, তুমিও কি মেলা দেখ্‌বে না কি?

নিতাই। হাঁ ভাই, বছরের একটা দেখ্‌বার জিনিষ, দেখে রাখি।

(দিগম্বর বাবুর প্রবেশ।)

মাধব। তাইত, একবার গিয়ে দেখে এলেও হয়। (দিগম্বর বাবুর প্রতি) মশাইও কি মেলায় যাচ্চেন?

দিগ। কোথায় মেলা, কিসের মেলা?

মাধব। এই যে মাঘী-পূর্ণীমায় নরেন্দ্রপুরে মস্ত মেলা হয়, তা কি মশাই জানেন না? আমরা যাচ্ছি, মশাই যাবেন কি?

দিগ। মেলায় গিয়ে কি হবে?

যাদ, মাধ, নিতা। কি হবে কি মশাই? দেখ্‌তে যাব, এ অঞ্চলে এত বড় মস্ত মেলা আর কোথাও হয় না।

দিগ। মেলায় আর কি দেখ্‌বে?

নিতাই। কত যায়গার কত লোক আস্‌বে—

দিগ। (নিতাইকে বাধা দিয়া) লোকের আর একটা কি দেখ্‌বো। যেমন তুমি আমি, এমনিতর দুশ পাঁচশ, না হয় দুই হাজার লোকই আস্‌বে, তার আর একটা দেখ্‌বো কি?

যাদব। কত যায়গা থেকে কত নানা রকমের জিনিষ——

দিগ। (যাদবকে বাধা দিয়া) জিনিষেরই বা একটা কি দেখ্‌বে; রোজই, কত রকম জিনিষ দেখ্‌ছ, আজ আর তার একটা নূতন কি? মেলায় গিয়ে বৃথা আমোদ করা ও সময় নষ্ট করা অপেক্ষা আমাদের

আরও অনেক গুরুতর কাজ আছে। তোমরা যেতে পার, আমার সময়ের অনেক মূল্য।

---

## দ্বিতীয় দৃশ্য।

### শিয়ালদহ ষ্টেশন।

বিনোদ ও তাহার পিতা রামহরি বাবু।

রামহরি। তাইত, এক আধ জন ভদ্র লোক পেলে তাঁকে না হয় বলে দিতাম, কখনও তুমি যাওনি, একেবারে একাকী কেমন করেই যাবে তাই ভাবছি।

বিনোদ। তা এত ভাবছেন কেন? ভয় আর কি, কত লোক ত যাচ্চে, আমি আর যেতে পারবো না?

(দিগম্বর বাবুর প্রবেশ।)

রামহরি। (দিগম্বর বাবুকে দেখিয়া) ভাল হ'ল, আপনি কোথা যাবেন?

দিগ। কেন, কি প্রয়োজন?

রামহরি। প্রয়োজন বিশেষ কিছুই নয়, তবে এই আমার ছেলেটী এই নূতন দারজিলিং যাচ্ছে, আর কখনও যায়নি, তাই আমি দেখ্‌ছিলাম, আর কেহ যদি যান, তবে তাঁকে একটু বলে দি, তিনি একে একটু দেখেন।

দিগ। দারজিলিং কেন? কোন কার্য্য উপলক্ষে?

রামহরি। না কাজকর্ম্ম কিছুই নয়। অনেক দিন থেকে পাহাড় দেখ্‌বে বলে আমাকে বড় ধরেছে, আর শরীরও ওর একটু খারাপ আছে, তাই পাঠিয়ে দিচ্ছি, কাজ কর্ম্ম কিছু নয়।

দিগ। পাহাড়ের আর একটা দেখ্‌বে কি?

বিনোদ। কেন, পাহাড়ের শোভা?

দিগ। পাহাড়ের আর একটা শোভা কি, স্তূপাকার পাথর বইত ও আর কিছু নয়? পাথর ত দেখেছ, তবে পাহাড় দেখা হয়েছে, পাহাড়ের আর বেশী একটা কি দেখ্‌বে?

বিনোদ। শুনেছি পাহাড়ের একটা কেমন গম্ভীর ভাব আছে, পর্ব্বতের তুষারমণ্ডিত শিরের উপর কিরণ প'ড়ে শুনেছি বড় শোভা হয়; পর্ব্বতের গায়ে ঝর ঝর করে যখন ঝরনা বহিতে থাকে, আর সেই ঝরনার জলে যখন উষার বরণ, চাঁদের কিরণ পড়ে তখনও বড় সুন্দর দেখায়। তাই একবার দেখ্‌তে যাচ্ছি।

দিগ। (রামহরির প্রতি) মহাশয় আপনি অতি অন্যায় কার্য্য কচ্ছেন। দেখ্‌ছেন না যে আপনার পুত্রের সর্ব্বনাশ হচ্ছে? আপনি এখনও সাবধান হউন। একে কখনও আপনি দারজিলিং যেতে দিবেন না। দারজিলিং না দেখেই এর এতদূর হয়েছে, দেখ্‌লে কি করবে জানি না। এ প্রকার কল্পনা-প্রিয় হয়ে পড়লে এর দ্বারা কোন কাজই হবে না। কল্পনার রাজ্যে বেড়ান অপেক্ষা আমাদের আরও গুরুতর কাজ আছে। আমি—

এমন সময়, সময় হওয়াতে ট্রেন ছাড়িয়া দিল, দিগম্বর বাবুর বক্তৃতা স্রোত হঠাৎ বন্ধ হইয়া গেল, তাঁর চমক ভাঙ্গিল তিনি বলিয়া উঠিলেন

"তাইত গাড়ী যে ছেড়ে দিলে।"

দিগম্বর বাবু বারাকপুর যাইতেছিলেন, বক্তৃতা ও "গুরুতর কার্য্যে" ব্যস্ত থাকায় তিনি গাড়ী 'মিস্' করিলেন। বিনোদ এ কেলে ছেলে, সে আগেই গাড়ীতে উঠে গলা বার করে কথা বলিতেছিল, গাড়ী যখন হুস্ হুস্ করে প্লাটফরম্ ছাড়িল, তখন সে দিগম্বর বাবুর দিকে চাহিয়া বলিল, "কল্পনার রাজ্যে তুমি বেড়াও, না আমি বেড়াই?' দিগম্বর বাবু ফ্যাল্ ফ্যাল্ করিয়া চাহিয়া চাহিয়া অবশেষে বাড়ী ফিরিয়া গেলেন।






জুন, ১৮৮৮।

# আদর্শ শিক্ষা।



অমল কৃষ্ণ মিত্র এবং কমলাকান্ত বসু—র বঙ্গ বিদ্যালয় হইতে ছাত্র-বৃত্তি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া এখন কলিতার কোন প্রসিদ্ধ স্কুলে অধ্যয়ন কবিতেছে। বালক দুটির মধ্যে বড়ই ভাব, আপন ভায়ে ভায়েও এমন সদ্ভাব এবং স্নেহ মমতা সচরাচর দেখা যায় না। ছেলে দুটির মধ্যে এইরূপ অকৃত্রিম ভাল-বাসা এবং সদ্ভাব দেখিয়া ইহাদিগের পিতা মাতা এইরূপ বন্দোবস্ত করিয়া দিয়াছেন যে, দুটিতেই একত্রে পড়া শুনা করে, একত্রে বেড়ায়, এবং একত্রে খেলা করে। এরূপ প্রায় দেখা যায় যে, ছেলেরা একবার বিদ্যালয় ছাড়িয়া গেলে শিক্ষক-দিগের সঙ্গে আর কোন সম্বন্ধ থাকে না, কিন্তু অমল ও কমলের এখনও—র বঙ্গ বিদ্যালয়ের শিক্ষকদিগের বিশেষতঃ প্রধান শিক্ষক মহাশয়ের সঙ্গে যথেষ্ট সম্বন্ধ আছে। অবসর পাইলেই ইহারা—র আসিয়া প্রধান শিক্ষক মহাশয়ের সহিত দেখা করে এবং অনেকক্ষণ তাঁহার কাছে থাকিয়া বাড়ী যায়। কেবল যে ছেলে দুটিই শিক্ষক মহাশয়ের কাছে আইসে তাহা নয়। শিক্ষক মহাশয়ও প্রায় মাঝে মাঝে কলিকাতায় গিয়ে ছেলে দুটিকে দেখিয়া আইসেন। কখন কখন শিক্ষক মহাশয় অমল ও কমলকে সঙ্গে লইয়া বেড়াইতে যান এবং এদিক ওদিক দেখিতে দেখিতে নানা প্রকার গল্প করেন। গল্প বটে, কিন্তু বড় কাযের গল্প, পরে জানিতে পারিবে। বস্তুতঃ বালক দুটি শিক্ষক মহাশয়ের বড়ই বাধ্য, তাঁহাকে না জিজ্ঞাসা করিয়া তাহারা কোন কায করে না, এদিকে শিক্ষক মহাশয়ও অমল ও কমলকে যথেষ্ট ভাল বাসেন ও যত্ন করেন; তাহারা সৎ-শিক্ষা পায়, সচ্চরিত্র হয়, এবং মনুষ্যত্ব লাভ করিতে পারে এই তাঁহার প্রাণের আকাঙ্ক্ষা। যাহাতে বালকেরা এক সঙ্গে শিক্ষা এবং আমোদ পায় এরূপ উপায় উদ্ভাবন করিতে তিনি সর্ব্বদাই যত্নবান।

বিগত গ্রীষ্ম অবকাশের সময় বালক দুটিকে সঙ্গে লইয়া এক দিন তিনি শিবপুর বটানিক গার্ডেনে (Botanical garden) যান, এবং প্রায় সমস্ত দিন সেখানে কাটাইয়া পাঁচটার সময় ফিরিয়া আইসেন। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে শিক্ষক মহাশয় বালক দুটির সঙ্গে নানা প্রকার গল্প করেন এবং সে সকল বড় কাযের গল্প; আর বাস্তবিক সে গুলি কত কাজের গল্প তাহা এই প্রবন্ধটি পাঠ করিলেই বুঝিতে পারিবে।

অ। আহা কি সুন্দর ঘাট, কেমন পরিষ্কার!

পণ্ডিত মহাশয় আসুন আমরা এই বাঁশতলায় কিছু কাল ব'সে বিশ্রাম করি এবং নদীর শোভা দেখি।

ক। অমল তুমি এর মধ্যেই কি ক্লান্ত হয়ে পড়েছ, এই না বল্‌ছিলে সমস্ত দিন বেড়াবে, চারিদিক ঘুরে দেখ্‌বে, আর সন্ধ্যা না হ'লে বাড়ী ফির্‌বে না?

অ। আমি ক্লান্ত হই নাই, নদীর শোভা দেখে বড় মুগ্ধ হয়েছি তাই এখান থেকে যেতে মন হচ্ছে না। দেখ অল্প অল্প বাতাসে নদীর বুকের উপর কেমন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঢেউ উঠ্‌ছে, আর ছোট ছোট নৌকাগুলি পাল তুলে কেমন নেচে নেচে চল্‌ছে। দেখ দেখ কি সুন্দর দৃশ্য। কলিকাতার দিকে এক বার চেয়ে দেখ, জাহাজের শত শত মাস্তুলগুলি কেমন দেখাচ্ছে বল দেখি।

ক। (কয়েকটি পাতা লইয়া) পণ্ডিত মহাশয়, কেমন সুন্দর পাতা দেখুন, এমন পাতা আর কখন দেখি নি।

প। কমল, বড় অন্যায় কায করেছ, পাতাগুলি ছেঁড়া উচিত হয় নি!

ক। কেন পণ্ডিত মহাশয়, বলুন না কেন অন্যায় হয়েছে? এই কটি পাতা ছেঁড়াতে গাছটি কি ম'রে যাবে?

প। বাগানের নিয়ম বিরুদ্ধ কায হয়েছে। গেটের দুই দিকে বড় বড় অক্ষরে কি লেখা আছে পড়িয়া দেখ। অমল এবং কমল তাড়াতাড়ি পড়িতে গেল।

প। পড়া হয়েছে, এখন কি বুঝ্‌তে পেরেছ কেন অন্যায় হয়েছে?

অ, ক। হাঁ পণ্ডিত মহাশয় পেরেছি।

প। তোমরা এইখানে একটু অপেক্ষা কর আমি আস্‌ছি।

অ। পণ্ডিত মহাশয় এত পাতা কোথা পেলেন আমাকে দিন না।

ক। আমাকে দিন না।

প। (পাতাগুলি ভাগ করিয়া দুজনের হাতে দিয়ে) আমি এই বাগানের অধ্যক্ষ মহাশয়ের নিকট কতকগুলি পাতা সংগ্রহ করিবার অনুমতি লইতে গিয়াছিলাম। তিনি আমার উদ্দেশ্য জানিতে পারিয়া অতি আগ্রহের সহিত একজন সর্দ্দারকে কতকগুলি পাতা সংগ্রহ করিয়া দিতে আদেশ করিলেন।

এখানে বলা আবশ্যক ঐ বাগানের অধ্যক্ষ এক জন হৃদয়বান লোক, এদেশের ছাত্রেরা উদ্ভিদ বিদ্যা ভাল করিয়া শিক্ষা করে এটি তাঁহার প্রাণের ইচ্ছা। তিনি অনেক সময়ে দুঃখ প্রকাশ করেন যে, এক শত বৎসর অতীত হইল এই বাগান স্থাপিত হইয়াছে, পঞ্চাশ বৎসরেরও অধিক হইতে উদ্ভিদ বিদ্যার চর্চ্চা হইতেছে কিন্তু এ পর্য্যন্ত একজন দেশীয় লোকও উদ্ভিদ বিদ্যা ভাল করিয়া শিখিল না।

অ। পণ্ডিত মহাশয় এখন চলুন বাগানের ভিতরে গিয়ে চারিদিক দেখি, ক্রমে বেলা বেশি হইতেছে।

প। আমিও তাই বল্‌ছিলাম ত, চল।

ক। (যাইতে যাইতে) পণ্ডিত মহাশয় এই চারা-গুলি রৌদ্রে মরে যাচ্ছে, দেখুন কেমন শুকিয়ে উঠেছে, বোধ করি ইহারা যত্ন করে জল-টল দেয় না।

প। না কমল তা নয়, ইহাদের শুকাইবার সময় হয়েছে, ইহারা আর অধিক দিন বেঁচে থাক্‌তে পারে না। এক বৎসর এমন কি কয়েক মাসের মধ্যেই, এই শ্রেণীর উদ্ভিদের সমস্ত কার্য্য শেষ হয়—বীজ হইতে চারা হয়, ফুল হয় এবং

ফুল হইতে আবার বীজ হয়। তোমরা ঐ চারা-গুলির কাছে গিয়ে দেখ, হয়ত ঐ শুষ্ক ফুলগুলির মধ্যে বীজ দেখ্‌তে পাবে।

অ। হ্যাঁ পণ্ডিত মহাশয় তাই ত।

ক। হ্যাঁ পণ্ডিত মহাশয় আপনি ঠিক বলেছেন। খুব ছোট ছোট হাজার হাজার বীজ রয়েছে।

প। এ শ্রেণীর চারা কি তোমরা আর কখন দেখনি?

ক। না, পণ্ডিত মহাশয়।

অ। আমি দেখেছি, আমাদের বাগানে প্রতি বৎসর শীতের পূর্ব্বে বাবা নানা রকমের চারা পোতেন, সেগুলিতে শীতের সময় কেমন সুন্দর সুন্দর ফুল হয়, আবার এই সময়ে শুকিয়ে যায়।

ক। হ্যাঁ পণ্ডিত মহাশয় মনে হয়েছে আমিও দেখেছি। আপনি সেবার কতকগুলি বীজ দিয়েছিলেন, আমি সেগুলি একটা গামলায় পুতে ছিলেম, দুই চা'র দিন পরে দেখি সেই বীজ থেকে অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র চারা বেরিয়েছে; ক্রমে সেই চারা-গুলির সুন্দর সুন্দর ফুল ফুট্‌ল, ফুলগুলি যখন ঝ'রে গেল তখন চারাগুলিও ক্রমে শুকিয়ে গেল।

অ। সকল প্রকারের গাছ ত এরূপ শুকিয়ে যায় না, আমাদের বাগানে যে বড় বড় আম, কাঁঠাল প্রভৃতির গাছ আছে তাহারা ত বরাবর বেঁচে থাকে।

প। হ্যাঁ তা ঠিক, আচ্ছা বল দেখি ইহা হইতে কি শিখ্‌লে।

ক। কি আর শিখ্‌ব।

অ। পণ্ডিত মহাশয় আমি বল্‌ব। কতকগুলি উদ্ভিদ অল্প কাল বাঁচে, আর কতকগুলি অধিক কাল বাঁচে।

প। বড় সন্তুষ্ট হলেম। পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গের মধ্যে যে নিয়ম, উদ্ভিদের মধ্যেও তাই। কোন কোন শ্রেণীর পশু দীর্ঘকাল বাঁচিয়া থাকে যেমন হস্তী, গণ্ডার, কোন কোন পশু চৌদ্দ, পনের বৎসরের অধিক বাঁচে না, আবার এমন অনেক জীব আছে যাহারা এক দিনের বেশীও বাঁচে না। উদ্ভিদ দিগের মধ্যেও সেই নিয়ম। পৃথিবীর অনেক স্থলে এমন বৃক্ষ আছে যাহাদের দীর্ঘ জীবনের কথা শুনিলে আশ্চর্য্য হইতে হয়। এই বাগানেই এমন অনেক গাছ আছে যাহাদের বয়স এখন এক শত বৎসরেরও অধিক। আবার কতকগুলি গাছ পাঁচ সাত বৎসরের মধ্যেই মরিয়া যায়।

ক। পণ্ডিত মহাশয়, আমি জানি পেঁপে গাছ পাঁচ সাত বৎসরের মধ্যে ম'রে যায়।

অ। কলা গাছ একবার ফলেই মরে যায়।

ক। পণ্ডিত মহাশয়, জীব জন্তুর কথা বল্‌বার সময় "বেঁচে থাকে" "ম'রে যায়" প্রভৃতি শব্দ ব্যবহার করা যায়, কিন্তু গাছ পালার কথা বল্‌তে ঐ সকল শব্দ কেন ব্যবহার করি? উদ্ভিদের সঙ্গে আর জীব জন্তুর সঙ্গে ত কোন সম্বন্ধ নাই।

প। জীব জন্তু কাহাকে বলে বল দেখি।

ক। কেন? এই হাতী, ঘোড়া গরু, ছাগল প্রভৃতি সব জীব জন্তু।

প। তা ত বুঝ্‌লেম; কেন ইহাদিগকে জীব বলে তাই শুন্‌তে চাই।

ক। ইহারা ইচ্ছামত চ'লে বেড়াতে পারে।

প। তার পর।

ক। ইহারা আহার করে,

প। আর কি?

ক। আর কি, জানি না।

অ। কেন পণ্ডিত মহাশয় জীব জন্তুর ছানা হয়, ছানা গুলি ক্রমে বড় হয়।

প। এ সকল জীবনের লক্ষণ বটে; কিন্তু ইহা অপেক্ষা আরও অনেক আছে। যা'ক, এই কয়েকটিতেই আমাদের আপাততঃ কায হবে।

এই সকল কথা বার্ত্তা হইতে হইতেই বেলা দুইটা বাজিয়া যায়। দুইটার পর বাগানের কর্ম্মচারিরা আপন আপন কায কর্ম্ম করিতে লাগিল।

ক। পণ্ডিত মহাশয় ঐ গাছগুলির গোড়ায় গোবর আর পচা পাতার মত কি দিচ্ছে;—কেন?

অ। পণ্ডিত মহাশয় দেখুন, ঝর্ণায় ক'রে কেমন জল দিচ্ছে, আর জল পেয়ে গাছগুলি কেমন সুন্দর দেখাচ্ছে।

প। তোমাদের ক্ষিদে পাই নি? বেলা ত দুটা বেজে গিয়েছে।

অ,ক। পণ্ডিত মহাশয় ক্ষিদে পেয়েছে।

প। তবে চল ঐ বট-গাছ তলায় বসে কিছুকাল বিশ্রাম করা যা'ক এবং সঙ্গে যাহা খাবার আছে তাহা আহার করা যা'ক।

বটতলায় সকলের উপবেশন।

প। আচ্ছা বল দেখি তোমরা যদি এখন কিছু না খাও কিম্বা কিছু না পান কর তা হ'লে কি হয়।

ক। কি আর হবে, আবার ক্ষিদে পায়।

প। তার পর।

অ। তার পর বোধ হয় কিছুকাল পরে আর চল্‌তে পারি না।

প। মনে কর দুই তিন দিন তোমাদিগকে যদি আহার কিম্বা জল না দিয়ে রাখা হয় তা হলে কি হয়?

ক। বোধ হয় আর উঠ্‌তে পারি না।

প। এইরূপ কুড়ি পঁচিশ দিন যদি আহার কিম্বা পান করিতে না পাও তাহা হইলে মরিয়া যাও।

স্কুলের সেই মালিকে জরিমানা করার কথা মনে আছে?

অ,ক। পণ্ডিত মহাশয়, আছে, আপনি স্কুলের বাগানে কতকগুলি চারা গাছ লাগিয়েছিলেন, মালি মনোযোগ করে সে গুলিতে জল দেয় নি, চারাগুলি মরে গিয়েছিল।

প। ঐ চারাগুলি শুকিয়ে যাওয়ার কারণ কি বল দেখি।

ক। কেন, জল না পেয়ে শুকিয়েছিল।

প। তবে দেখ্‌তে পাচ্ছ আমরা জল না পান কর্‌তে পেলে, আহার না পেলে যেমন মরিয়া যাই উদ্ভিদ্ জাতিও তেমনি মরিয়া যায়।

অ। উদ্ভিদ্‌রা কি কেবল জলেই বাঁচে, আর কোন আহার তাদের আবশ্যক হয় না?

প। হয় বই কি। উদ্ভিদের আহারের উপযুক্ত পদার্থ মাটিতে আছে, জলের সহিত সেই সকল পদার্থ মিশ্রিত হইয়া উদ্ভিদের শরীরে প্রবেশ করে। আহার দ্বারা যেরূপ মনুষ্য এবং অন্য অন্য জীব জন্তুর শরীর পুষ্ট হয় এই সকল পদার্থ দ্বারা সেইরূপ উদ্ভিদাদির শরীর পুষ্ট এবং বর্দ্ধিত হয়।

ক। গাছে জল দেওয়ার কি উপকার তা আমরা বুঝ্‌লেম কিন্তু ঐ গোবর এবং পাতা পচা কেন দিচ্ছে তা ত বল্লেন না।

প। জমিতে সার দেওয়ার কথা তোমরা কখন শুননি কি?

অ। শুনেছি, পণ্ডিত মহাশয় শুনেছি।

ক। সার দেওয়ার কথা আমিও শুনেছি, কিন্তু ইহার উদ্দেশ্য কি ভাল করিয়া বুঝিতে পারি নি।

প। ক্রমে রসায়ন এবং উদ্ভিদ্ বিদ্যা যত অধ্যয়ন করিবে ততই জানিতে পারিবে যে ঐ গোবর এবং পাতা পচার মধ্যে এমন সকল পদার্থ আছে যাহা দ্বারা উদ্ভিদদিগের জীবন রক্ষা হয়, উহারা ঐ সকল পদার্থ আপন শরীরে শোষণ করিয়া বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়।

ক। মাটিতেই ত ঐ সকল পদার্থ আছে, তবে কেন সার দেয়।

প। তোমাদের বাড়ীতে দেখিয়াছ যে, ভাঁড়ার ঘরে অনেকগুলি খাবার দ্রব্য সঞ্চয় করা থাকে; ঐ সকল দ্রব্য বাড়ীর লোকের আহারের জন্য প্রত্যহ খরচ হয়, ক্রমে যখন ভাঁড়ার ঘরের জিনিষগুলি কমিয়া আসে কিম্বা একেবারে ফুরাইয়া যায় তখন আবার ঐ সকল জিনিষ খরিদ করিয়া আনিতে হয়। এখন মনে কর, জিনিষগুলি ফুরাইয়া গেল, কিন্তু আর নূতন কিছু খরিদ করা হইল না, ক্রমে ভাঁড়ার ঘর শূন্য হইয়া গেল, কোন দিক হইতে আহারের উপযুক্ত কোন দ্রব্য আসিবার সম্ভব নাই—এরূপ অবস্থায় কি হয়?

অ,ক। আমরা কেহই খেতে পাইনে।

প। তার পর।

অ,ক। ক্রমে বেশি দিন এইরূপ চলিলে আহার অভাবে মরিয়া যাই।

প। এখন বোধ হয় বুঝতে পেরেছ সার দেওয়ার কি উপকারিতা

অ। পণ্ডিত মহাশয় বেশ বুঝিয়াছি।

প। বল দেখি কি বুঝিয়াছ?

অ। নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ জমিতে উদ্ভিদ্‌দিগের আহারের উপযুক্ত নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ পদার্থ থাকে। উদ্ভিদ্‌রা জমি হইতে সেই সকল পদার্থ ক্রমাগত চুষিতে চুষিতে অবশেষে আর কিছুই অবশিষ্ট থাকে না, তখন আর তাহারা আহার পায় না কাযেই নূতন করিয়া এমন কোন পদার্থ দিতে হয় যাহা দ্বারা ঐ জমি পুনর্ব্বার উর্ব্বরা হইয়া উঠে।

প। এখন তোমরা বুঝলে জীব জন্তুর ন্যায় উদ্ভিদ্‌ জাতিও আহার করে।

অ,ক। বেশ বুঝেছি।

ক। কৈ জীব জন্তুর ন্যায় উদ্ভিদ্‌দিগের ত ছানা টানা হয় না।

প। হয় বই কি।—র বিদ্যালয়ের চারিদিগে যে সকল কৃষ্ণ বাবলার গাছ আছে তাহাদের ইতিহাস মনে কর দেখি।

ক। আমরা যেবার চতুর্থ শ্রেণীতে পড়ি সেবার শরতের বড় গাছতলা থেকে আমরা কতকগুলি কাল কাল বীজ কুড়াইয়া আনি; দুই এক দিন পরে সে গুলিকে তিন চারিটা টবে বোনা হয়, দুই তিন দিন পরেই ঐ সকল বীজের অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র চারা বাহির হয়, চারাগুলি ৪।৫ ইঞ্চ বড় হইলে মালি সেগুলিকে তুলিয়া বেড়ার ধারে ধারে লাগিয়ে দেয়, এই কয়েক বৎসরের মধ্যেই ঐ চারা হইতে কত বড় বড় গাছ হয়েছে।

প। পশু পক্ষীর মধ্যেও কি ঠিক এইরূপ দেখা যায় না? ঐ বুল বুলি পাখী দুটির কথা মনে করে দেখ; প্রথমতঃ ডিম পাড়িল, কিছু দিন পরে তিনটি ডিম হইতে তিনটি অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ছানা বাহির হইল, ঐ ছানাগুলি ক্রমে ক্রমে বড় হইয়া এখন উড়িয়া গিয়াছে। যে সকল নিয়মে পাখীর ডিম হইতে ছানা বাহির হয় সেই সেই নিয়মে উদ্ভিদ্‌দিগের বীজ হইতে চারা নির্গত হয়। যে সকল নিয়মে পাখীর অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ছানা ক্রমে বড় হয় সেই নিয়মেই চারা গাছ হইতে বড় বড় গাছ হয়।

অ। বড় মজার, উদ্ভিদ্‌ শ্রেণীও তা হ'লে সজীব পদার্থ—



# ভুলু বাবু ও তাঁহার বিড়াল।

আমাদের ভুলু বাবু বড় আব্‌দারে ছেলে। তিনি যাহা চাহিবেন তাহাই তাঁহাকে দিতে হবে; না দিলে হাত পা ছুঁড়ে চীৎকার করে, বাড়ী দূরে থাক, পাড়া শুদ্ধ মাথায় করে তুলেন। এই রকম যখন তাঁর জিদের ঝোঁক চড়ে তখন তাঁর মা সহ্য করিতে না পারিয়া খুব প্রহার করেন, না হয় হাত পা বাঁধিয়া ফেলিয়া রাখেন, আর অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত কিছুই খাইতে দেন না। ইহাতে ভুলুবাবু অনেক সময়ে বেশ জব্দ হন, তবু কিন্তু তাঁর আব্‌দারে স্বভাব একবারে যায় না। যাহা করিলে তাঁহার অনিষ্ট হইতে পারে তাহা তাঁহাকে বলিলে, বুঝাইলে বা তজ্জন্য শাসন করিলেও তাঁহার জিদ ছাড়েন না। কেমন যে বদ স্বভাব সে আর শুধরায় না।

এ ছাড়াও ভুলু বাবুর একটা গুণ ছিল, তিনি কাহাকেও না বলিয়া চুপে চাপে যেখানে যে খাবারটুকু পাইতেন অমনি মুখের ভিতর পুরিতেন। একদিন তার দিদিমা পূজার জন্য কলা সন্দেশ প্রভৃতি রাখিয়া অন্য ঘরে গিয়াছেন ইতিমধ্যে ভুলু বাবু সেই ঘরে আসিয়া সব নষ্ট করিয়া গেলেন। আর একদিন তার মা তার দিদিকে দুটো ভাল আম খাইতে দিয়াছিলেন সে তখন না খাইয়া সিন্দুকের আড়ালে লুকাইয়া রাখে। খানিক পরে খাবে এই তার ইচ্ছা। কিন্তু ভুলু বাবুর নজর সব দিকে যায়, বিশেষতঃ খাবার দিকে। যেই তার দিদি একটু এদিক ওদিক গিয়াছে অমনি ভুলু বাবু আম দুটী সেখান হইতে সরাইয়া একটী উদরসাৎ করিলেন, আর একটী খাইতে না পারিয়া নর্দ্দমায় ফেলিয়া দিলেন। ভুলু বাবু এই ধরণের ছেলে। আমার বেশ মনে হচ্চে সে একদিন খুব জব্দ হয়েছিল। লোভ আর জিদ দুইএরই ফল পাইয়াছিল। সেদিন তার দিদিমা কাসন্দি তৈয়ার করিবেন বলিয়া এক ডালা সরিষা গুঁড়া করিয়া রাখিয়াছেন, ভুলু বাবু কি মনে করিয়া জানি না, বোধ হয় চিনি বা ছাতু মনে করিয়া, এক-মুঠো লইয়া গালে পুরিলেন। খুব ঝাল লাগিয়াছে, কাঁদিতেও পারিতেছে না, কাহাকেও বলিতেও পারিতেছে না। পাছে তাহার লোভের ফল ধরা পড়ে এই লজ্জায় চুপ করিয়া রহিল। চোখ দিয়া দরদর করিয়া জল পড়িতে লাগিল। আমি পূর্ব্বে এবিষয় কিছুই টের পাই নাই। আমি হঠাৎ দেখিতে পাইলাম ভুলু টবের কাছে গিয়া কেবলই মুখ ধুইতেছে আর জিব রগ্‌ড়াইতেছে। তার পর সব জানিতে পারিলাম। যেমন লোভ তেমনি ফল।

সেই দিন রাত্রে তার বাবা চিম্‌নি দেওয়া ল্যাম্পের সম্মুখে পড়িতেছিলেন, ভুলু বাবুর জিদ হইল চিমনিটী লইবেন। তার মা তাকে কত বারণ করিলেন কত বুঝাইলেন যে, হাত পুড়িয়া যাইবে, তা বাবু জিদ ছাড়িবেন কেন, 'আমি চিমনি নেবো'—বলে চেঁচাইতে আরম্ভ করিলেন। মার কাছে দু চার ঘা চড়ও খাইলেন, তবুও জিদ। তখন তার বাবা রাগিয়া বলিলেন 'আয় চিমনি নে এসে'। ভুলু বাবু যেই চিমনিতে হাত দিয়াছেন অমনি বড় গরম লাগিয়াছে আর তৎক্ষণাৎ হাত সরাইয়া লইলেন। তার বাবা ছাড়িলেন না, তিনি তার হাত টানিয়া লইয়া সেই আগুনের মত তপ্ত চিম্‌নি ধরাইয়া দিয়া বলিলেন 'না তুই চিমনি নিবি,তোকে নিতেই হবে'।—ভুলু

বাবুর হাত পুড়িয়া গেল, হাতের সব আঙ্গুলগুলিতে ফোস্কা পড়িল, যন্ত্রণায় ভুলু বাবু চীৎকার করিতে লাগিলেন। আহা! বেচারার হাত পুড়িয়া গিয়াছে তার দিদির বড় দয়া হইল সে তার স্কুলের প্রাইজে একটা খেলিবার ভেড়া পাইয়াছিল সেটা ভুলুকে দিল। ভুলু সেই খেলনা পাইয়া শান্ত হইলেন। সেই রাত্রে ভুলু আর কোন আব্দার করে নাই।

তার পরদিন সকাল বেলা ভুলু বাবু দেখেন যে তাঁহার বিশেষ প্রিয় সখের বিড়ালটী কাঠের বেড়ার উপর দিয়া মুখ বাড়াইয়া ম্যাও, ম্যাও, করিতেছে আর তার চোখ দিয়া টপ টপ্ করিয়া



জল পড়িতেছে। বিড়ালটী ভুলু বাবুর নিজের। সেই বিড়ালের সঙ্গে তার বড় ভাব। যেমন লোক তার তেমনি বন্ধু। বিড়ালটীও ঠিক ভুলু বাবুর মত। বিড়াল দুধ মাছ চুরি করিয়া খায়। হাজার বার মার তবুও তার স্বভাব যায় না। খাইতে বসিলে পাতে মুখ দিতে আইসে, মারিয়া তাড়াইয়া দাও তবুও আসিবে। যেন জিদ্। আর যা খাবে একবার মনে করিয়াছে, তা সে না লইয়া ছাড়িবে না। আসে পাশে ঘুরিতে থাকে কত উপায় ফন্দি খোঁজে, সুবিধা পাইলেই লইয়া পলায়। ভুলু বাবু আজ কিছুতেই ঠিক করিতে পারিতেছেন না বিড়ালটা কেন এত দুঃখিত! বিড়ালের কান্না দেখে ভুলুর কান্না আসিল, এমন কি সেই কাপড়ের ভেড়াটারও চোখ দিয়া দুই এক ফোঁটা জল পড়িল। অনেকক্ষণ পরে ভুলু বাবু বেড়ার ও পাশে গিয়া দেখিতে পাইলেন বিড়ালটা আজ কেন এত দুঃখিত। তখন তার কল্যকার ঘটনা



মনে পড়িল। আমি গিয়া দেখি তিনি আর তাঁর বিড়াল কি পরামর্শ করিতেছেন। অনেকক্ষণ ধরিয়া এই গোপনীয় পরামর্শ চলিতেছিল। কি পরামর্শ হইতেছিল আমি তাহার কিছুই শুনিতে পাই নাই, তোমরা তাহা জানিবার জন্য অত উৎসুক হইও না। আমি সে সম্বন্ধে কিছুই বলিতে পারিব না।

আজ অনেক দিন পরে তার মার কাছে শুনিলাম ভুলুর বিড়াল সেই দিন হইতে আর কিছুই চুরি করিয়া খায় না, পাতেও মুখ দিতে আইসে না। আরও শুনিলাম, ভুলুর দিদিমা বলিলেন ভুলু সেই দিন হইতে বড় শান্ত হইয়াছে। এখন আর কোন উপদ্রব করে না, দিদিমার পূজার কলা সন্দেশ চুরি করে না, কাহারও নিকট হইতে না চাহিয়া লইয়া কিছু খায় না। তাহার জিদ্ এখন মোটেই নাই।



## কোথায় গেল মা ?

কোথায় গেল মা ?
এই যে আকুল হ'য়ে
স্নেহ ভরে ছিল চেয়ে,
কখন সে আঁখি জ্যোতি কেমনে নিভিল,
অকস্মাৎ আঁখি মার কেন নিমিলিল ;
সেই যে মা চেয়ে ছিল
আর ত চাহিল না !
—কোথায় গেল মা ?

এই যে হাতটি ধ'রে
স্নেহভরে কাছে ডেকে,
মুখ খানি ধ'রে ধীরে কত কি বলিল মা,
সেই কথা কয়েছিল
আর ত কহিল না !
—কোথায় গেল মা ?

আকুল নয়নে তাঁর
দেখিলাম অশ্রুধার,
স্নেহ-মাখা মুখে তাঁর বিষাদের ছায়া ;
কি ব্যথা হৃদয়ে আছে
শুধাইতে গেনু কাছে
শুধানও হল না !
—কোথায় গেল মা ?

এত স্নেহ এত মায়া
আজি সব শূন্য—ছায়া,
অনন্ত অজানা কোন দেশে চলে গেল,
কেন যে মা চলে গেল
তাও ব'লে গেল না !
—কোথায় গেল মা ?

বড় যে অনাথ হয়ে
ফিরিতেছি চেয়ে চেয়ে,
এত স্নেহ এত মায়া, সব কি ভুলেছে মা !
অনাথের অশ্রু হেরে
মা কি চাহিবেনা ফিরে,
আর কি মা আসিবে না !
—কোথায় গেল মা ?

কাছে ডেকে অতি ধীরে
স্নেহভরে বুকে করে
আকুল নয়নে, মুখ পানে চেয়েছিল ;
চেয়ে চেয়ে অবশেষে
বলিল—যাই মা !
—আর ত এল না !
মা আমার—মা আমার
আর কি আসিবে না ?
—কোথায় গেল মা ?

# ফ্লোরেন্স্ নাইটীঙ্গেল।

( ৫৫ পৃষ্ঠার পর। )

স্কুটারীর হাঁসপাতালের অবস্থা দিন দিন কি প্রকার ভীষণ হইয়া উঠিতেছিল আমরা গত পূর্ব্ববারে তাহার কতক উল্লেখ করিয়াছি। ক্রমে হাঁসপাতালের অত্যাবশ্যকীয় দ্রব্যাদিরও অত্যন্ত অভাব হইয়া উঠিল। রোগীদিগকে রীতিমত পথ্য পর্য্যন্ত দিবার উপায় ছিল না, এতদ্ভিন্ন বস্ত্রাদি এবং বিশেষতঃ সেবা শুশ্রূষার অভাবে শত শত রোগী মৃত্যুগ্রাসে পতিত হইতে লাগিল। টাইমস্ নামক বিলাতের বিখ্যাত সংবাদপত্রের সংবাদদাতা লিখিলেন যে, এই শত শত আহত এবং রোগগ্রস্ত সৈনিকদিগকে যে ভাবে তাহাদিগের সঙ্গীগণ হাঁসপাতালে রাখিয়া যাইত, সেই ভাবেই তাহারা ভূমিতে পড়িয়া থাকিত; ভূমিতল হইতে শয্যায় উঠাইয়া রাখিবে এমন একখানি শয্যা ছিল না। ইহাদিগকে বাঁচাইবার জন্য তিলমাত্র চেষ্টা করা হয় নাই। তিনি লিখিয়াছেন "the sick appear to be tended by the sick and the dynig by the dying" অর্থাৎ রোগীর সেবা রোগী করিতেছে এবং যে মৃতপ্রায় আর একজন মৃতপ্রায় ব্যক্তি তাহার সেবা করিতেছে। বাস্তবিক এমনই দুর্দ্দশা হইয়াছিল।

স্কন্ধহীন, পদহীন এবং নানাপ্রকারে আহত এবং রোগগ্রস্থ শত শত রোগীর আর্ত্তনাদে হাঁসপাতাল পরিপূর্ণ হইয়াছিল, সে যন্ত্রণার সেবা করিবার কেহ নাই; তৃষ্ণায় একবিন্দু জল দিবে এমন কেহ নাই। যেমন একদিকে বস্ত্রাদি এবং ঔষধ পথ্যের অভাব, অন্যদিক তেমনি শুশ্রূষার অভাব। অশেষ যাতনা পাইয়া শত শত ইংরাজ সৈন্য মৃত্যুমুখে পতিত হইতে লাগিল। এই শোচনীয় দুর্দ্দশার কথা—এই নিদারুণ সংবাদ ইংলণ্ডে পৌঁছিল। বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট বহু অর্থ ব্যয় করিয়াও কিছু করিয়া উঠিতে পারিলেন না। আর এই নিদারুণ সংবাদে ইংলণ্ডের লোক একেবারে হতবুদ্ধি হইয়া পড়িল, কি প্রকারে এই অশেষ দুর্দ্দশাগ্রস্ত, অসহায় সৈনিকদিগের রক্ষা হইবে, সকলেই তাহার জন্য আকুল, সকলেই তাহার জন্য ব্যস্ত, কিন্তু কি উপায় অবলম্বন করিলে ইহারা রক্ষা পাইবে, তাহার একটা সৎপরামর্শ কেহই দিতে পারিলেন না।

আমরা পূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি যে, হার্লিষ্ট্রীটের স্বাস্থ্যাবাসের উন্নতির জন্য চিন্তা ও দুই তিন বৎসরের অবিশ্রান্ত পরিশ্রমে নাইটীঙ্গেলের স্বাস্থ্য ভগ্ন হইয়াছিল এবং নিতান্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেও কিঞ্চিৎ বিশ্রামের জন্য তিনি গৃহে ফিরিয়া যাইতে বাধ্য হইয়াছিলেন। ইংরাজ সৈন্যের এই নিদারুণ দুর্দ্দশার সংবাদ নাইটীঙ্গেল এই সময় শুনিতে পাইলেন। ক্রিমিয়া যুদ্ধে ইংরাজ সৈন্যের দুর্দ্দশার সংবাদে সমস্ত ইংলণ্ডে যে ভীষণ আন্দোলন উঠিয়াছিল, নাইটীঙ্গেলের শান্তিময় গৃহেও তাহা পৌঁছিল। ইংলণ্ডের প্রধান প্রধান ব্যক্তিগণও এই নিদারুণ সংবাদে হতবুদ্ধি হইয়া পড়িয়াছিলেন, কিন্তু নাইটীঙ্গেল তাহা হন নাই। সমস্ত ইংলণ্ড যে সংবাদে আকুল হইয়াছিল, ফ্লোরেন্স্ নাইটীঙ্গেল তাহাতে ধীর, স্থির, অবিচলিত ছিলেন। ইংরাজ সৈন্যের দুর্দ্দশার সংবাদে তাঁহার হৃদয় ব্যাকুল হইল বটে, কিন্তু তিনি তাহাতে হতবুদ্ধি না হইয়া কি উপায়ে ইহাদিগকে রক্ষা করিতে পারিবেন তাহাই চিন্তা করিতে লাগিলেন।

নাইটীঙ্গেল দেখিলেন, তিনি নিজে অগ্রসর না হইলে, নিজে প্রাণ সমর্পণ না করিলে কিছুই হইবে না; তখন তিনি তাহার জন্যই প্রস্তুত হইলেন। অন্যের সেবায় যিনি জীবন উৎসর্গ করিয়াছেন, শত শত আহত রোগগ্রস্ত সৈনিকের হৃদয়বিদারক আর্ত্তনাদে, তিনি কেমন করিয়া স্থির থাকিবেন? নাইটীঙ্গেল তখনকার সমর-সচিবের নিকট এই মর্ম্মে এক পত্র লিখিলেন যে, তিনি এই শত শত দুর্দ্দশাগ্রস্ত সৈনিকদিগের সেবা শুশ্রূষার জন্য নিজ জীবন উৎসর্গ করিতে প্রস্তুত হইয়াছেন। যে দিন সমর-সচিবের নিকটে নাইটীঙ্গেল পত্র লিখিয়াছিলেন, সেই দিন সমর-সচিবও নাইটীঙ্গেলের নিকট তাঁহার পত্র পাইবার পূর্ব্বেই এই সম্বন্ধে এক পত্র লিখিয়াছিলেন। তিনি বেশ জানিতেন, এ শোচনীয় দুর্দ্দশা হইতে অসহায় সৈনিকদিগের রক্ষা করিতে পারে, ফ্লোরেন্স্ নাইটীঙ্গেল ভিন্ন ইংলণ্ডে তদুপযুক্ত লোক আর কেহ নাই। নাইটীঙ্গেলকে শত শত বৃটিশ সৈন্যের প্রাণ রক্ষার জন্য তিনি অনুরোধ করিয়া এক পত্র লিখিয়া পাঠাইলেন। তিনি আরও লিখিলেন যে, ফ্লোরেন্স নাইটীঙ্গেল এই কার্য্যের জন্য যখন যাহা আদেশ করিবেন, বৃটীশ গবর্ণমেণ্ট তৎক্ষণাৎ তাহাদিতে প্রস্তুত আছেন। এতদ্ভিন্ন তাঁহার সাহায্যের জন্য ডাক্তার যে কয়েকজন প্রয়োজন হইবে তিনি তাহাও পাইবেন। এবং তিনি যখন যে আদেশ করিবেন, তৎক্ষণাৎ তাহা পালন করা হইবে। পরোপকারব্রত-পরায়ণ ফ্লোরেন্স্ নাইটীঙ্গেল হৃষ্টচিত্তে সম্মত হইলেন; এবং আর কাল বিলম্ব না করিয়া কার্য্যের উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। সে সময়ও কার্য্যাধ্যক্ষ শুশ্রূষা-কারিণী মহিলাগণের সংখ্যা অধিক ছিল না; কিন্তু নাইটীঙ্গেল অনেক চেষ্টা করিয়া চৌত্রিশ জন সহচরী সংগ্রহ করিলেন, এবং শোচনীয় দুর্দ্দশাগ্রস্ত শত শত বৃটীশ সৈন্যের জীবন রক্ষার জন্য যাত্রা করিলেন।

শত সহস্র স্কন্ধহীন, হস্তপদ বিহীন এবং নানা-প্রকারের আহত ও রোগগ্রস্ত সৈনিকদিগের আর্ত্তনাদ যেখানে অবিশ্রান্ত আকাশ ভেদ করিয়া উঠিতেছে, যেখানে মুমূর্ষুকে একবিন্দু জল দিবার কেহ নাই, চারিদিক কেবল হাহাকারে পরিপূর্ণ, সেই ভীষণ দৃশ্যময় স্কুটারীর হাঁসপাতালে, পরোপকারব্রত-পরায়ণ ফ্লোরেন্স্, তাঁহার সহৃদয়া সহচরীদিগের সহিত ৫ই নবেম্বর উপস্থিত হইলেন। নাইটীঙ্গেল দেখিলেন অভাব অত্যন্ত অধিক, কিন্তু কার্য্য করিবার লোক অত্যন্ত অল্প। কিন্তু দৃঢ় প্রতিজ্ঞা, অবিচলিত অধ্যবসায়, এবং প্রাণের ঐকান্তিক যত্ন থাকিলে, বিঘ্ন বাধা মুহূর্ত্তে দূরে চলিয়া যায়। যে কঠিন ব্রতে তাঁহারা জীবন উৎসর্গ করিয়াছেন, প্রাণ সমর্পণ না করিলে সে ব্রত উদযাপন হইবে না নাইটীঙ্গেল তাঁহার সহচরীদিগকে ইহা বুঝাইয়া দিলেন, এবং নিজের দৃষ্টান্ত-দ্বারা তাঁহাদিগকে কর্ত্তব্য পথ দেখাইতে লাগিলেন। এইরূপ দিবারাত্র অক্লান্ত ভাবে তাঁহারা আহত ও রোগগ্রস্থদিগের পরিচর্য্যায় নিযুক্ত হইলেন। রোগীর সেবা ভিন্ন নাইটীঙ্গেলের আরও অনেক গুরুতর কার্য্য করিতে হইত। হাঁসপাতালের সমস্ত ভারই তাঁহার হস্তে ছিল। হাঁসপাতাল সম্বন্ধে যে যে কার্য্য সমস্তই তাঁহার দেখিতে হইত, সমস্ত বন্দোবস্ত তাঁহাকেই করিতে হইত। অক্লান্ত পরিশ্রম, অবিচলিত অধ্যবসায় এবং প্রাণগত চেষ্টার গুণে, অল্পদিনের মধ্যেই বিশৃঙ্খলার মধ্যে শৃঙ্খলা, অশান্তির মধ্যে শান্তি আনয়ন করিলেন; সহস্র সহস্র আহত ও রোগগ্রস্তদিগের আর্ত্তনাদে যে স্থান শ্মশানে পরি-

ণত হইয়াছিল, সে স্থান করুণার জ্যোতিতে শান্তিময় হইয়া উঠিল। বাস্তবিক যে স্থানে ফ্লোরেন্স্ নাইটীঙ্গেলের সেই সুন্দর স্নেহময়ী, করুণাময়ী, শান্ত মূর্ত্তি উপস্থিত হইত, সেই খানেই শান্তি ও করুণা বিস্তার হইত। তাঁহার করুণ, স্নেহমাখা সম্ভাষণে তাঁহার কোমল স্নেহমাখা কর স্পর্শে রোগী অসহ্য রোগ যন্ত্রণাও বিস্মৃত হইত। তাঁহার ধর্ম্মের সান্ত্বনা বাক্যে মুমূর্ষু ইহলোক শান্তিতে পরিত্যাগ করিত। রাত্রি নাই, দিন নাই, নিজের শরীরের দিকে দৃষ্টি নাই, রমণী পুলকিত মনে, অক্লান্ত দেহে বুকভরা আসা ও উৎসাহের সহিত, রোগীর সেবা করিতে লাগিলেন। সহস্র সহস্র লোক তাঁহার সেবা ও শুশ্রূষার গুণে প্রাণ পাইল। সেবা শুশ্রূষার যেখানে অধিক প্রয়োজন, রোগ যেখানে কঠিন, রোগীর আর্ত্তনাদ যেখানে অধিক, মৃত্যু যেখানে আসন্ন, সেইখানেই নাইটীঙ্গেলের করুণাময়ী মূর্ত্তি। মুমূর্ষুও তাঁহাকে দেখিলে যেন প্রাণ পাইত। নাইটীঙ্গেল যখন রোগীদিগের শয্যাপার্শ্ব দিয়া যাইতেন, তখন তাহাদের রোগ-শীর্ণ-মুখ প্রফুল্ল হইয়া উঠিত, তাঁহার জন্য তাহাদিগের হৃদয়ের কৃতজ্ঞতা উছলিয়া উঠিত। চিকিৎসকগণ এবং অন্যান্য সকলে যখন নিদ্রিত, গভীর রাত্রির সেই গভীর অন্ধকারের মধ্যে করুণার প্রতিমূর্ত্তি ফ্লোরেন্স্-নাইটীঙ্গেল একটী ক্ষুদ্র দ্বীপ হস্তে, রোগীদিগকে দেখিয়া বেড়াইতেন। একজন আহত সৈনিক হাঁসপাতাল হইতে এক পত্রে লিখিয়াছিল, "তিনি (নাইটীঙ্গেল) এই সহস্র সহস্র রোগীদিগের সকলের সহিত সকল সময় কথা বলিতে পারিতেন না, যাহার সহিত কথা বলিতে না পারিতেন তাহাদিগের দিকে চাহিয়া ঈষৎ হাসিয়া বা অন্য প্রকারে সম্ভাষণ করিতেন। অনেক সময় তাহাও যখন না পারিতেন, আমরা তাঁহার ছায়া চুম্বন করিয়াই তখন তৃপ্ত হইয়া পুনরায় নিদ্রা যাইতাম।" স্কুটারীর হাঁসপাতালে দেড় বৎসর পর্য্যন্ত এই প্রকার অক্লান্ত দেহে, প্রফুল্ল মনে এবং প্রাণের একাগ্রতার সহিত কার্য্য করিয়া নাইটীঙ্গেল ব্যালাক্লাভার হাঁসপাতালে গেলেন। দেখিলেন ব্যালাক্লাভার হাঁসপাতালের অবস্থা অধিকতর শোচনীয়। কিন্তু তাহাতে তিনি ভগ্নোৎসাহ না হইয়া বরং অধিকতর উৎসাহে ও অধ্যবসায়ের সহিত কার্য্য আরম্ভ করিলেন। কিন্তু এই কঠিন পরিশ্রম তাঁহার কোমল দেহে সহিল না; তিনি অল্প দিনের মধ্যেই অত্যন্ত পীড়িত হইয়া পড়িলেন, সকলে তাঁহার জীবনের আশা পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। কিন্তু সে বার তিনি রক্ষা পাইলেন। অবশেষে ক্রিমিয়া যুদ্ধের অবসানে নাইটীঙ্গেল স্বদেশে ফিরিলেন; সমস্ত ইংলণ্ডের লোক তাহাদের জাতীয় গৌরব, ফ্লোরেন্স্ নাইটীঙ্গেলকে অভ্যর্থনা করিয়া লইবার জন্য মহা আয়োজন করিল। কিন্তু নাইটীঙ্গেল এমনি গোপনে গৃহে ফিরিয়া গেলেন যে, কেহ তাহা জানিতে পারিল না। লোকের প্রশংসা লইয়া তিনি কি করিবেন? ধন, ঐশ্বর্য্য, জীবন, যৌবন যে ব্রতে উৎসর্গ করিয়াছেন, তাহার সাধনেই তাঁহার অতুল সুখ।

নাইটীঙ্গেল ক্রিমিয়ায় যে সাংঘাতিক রোগে আক্রান্ত হইয়াছিলেন, তাহা হইতে রক্ষা পাইয়াছিলেন বটে, কিন্তু তাঁহার স্বাস্থ্য জন্মের মত হারাইয়াছিলেন; এই সময় হইতে তিনি আর বড় বাড়ীর বাহির হন নাই; প্রকাশ্য স্থানে আর বড় তাঁহাকে দেখিতে পাওয়া যায় নাই। কিন্তু তাঁহার দেহ ভগ্ন হইলেও হৃদয় ভগ্ন হয় নাই; হৃদয়ের সেই উৎসাহ, সেই আশা, সেই অধ্যবসায়, পরোপকারের জন্য, সৎকার্য্যের

জন্য সেই অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষা তেমনি ছিল। পীড়িত এবং যুদ্ধে আহত ব্যক্তিদিগের শুশ্রূষার জন্য রেড ক্রস্ সোসাইটী নামে একটি সভা স্থাপিত হইল, নাইটীঙ্গেল তাহার একজন প্রধান উদ্যোগী ছিলেন। ভিন্ন ভিন্ন দেশেও তাঁহার কত প্রতিপত্তি, কত সম্মান ছিল, আমেরিকায় যখন যুদ্ধ হয়, তখন কি প্রকারে আহত সৈনিকদিগের শুশ্রূষার সুবন্দোবস্ত হইতে পারে তাহার নিকট সে বিষয়ে পরামর্শ লওয়া হয়। ফরাসী ও জর্ম্মাণদিগের সহিত যে যুদ্ধ হয় তাহাতে জর্ম্মাণদিগের হাঁসপাতালে সেবা শুশ্রূষার বন্দোবস্ত কি প্রকারে করিতে হইবে, তাহার পরামর্শ দিয়াছিলেন। বিস্‌বন নগরে বালক বালিকাদিগের জন্য যে হাঁসপাতাল আছে, তাহা তাঁহার পরামর্শ মতই নির্ম্মিত হইয়াছিল। অষ্ট্রেলিয়া এবং আমাদের ভারতবর্ষের হাঁসপাতাল গুলিও তাঁহার নিকটে অনেক ঋণী। রোগীদের সেবা শুশ্রূষা এবং হাঁসপাতালের কার্য্য সম্বন্ধে তিনি অদ্বিতীয় ছিলেন। গত ২৫ বৎসরে ইংলণ্ডে যে সকল হাঁসপাতাল নির্ম্মিত হইয়াছে, তাহার প্রায় সকল গুলিই তাঁহার পরামর্শ মত।

ইংলণ্ড ফ্লোরেন্স্ নাইটীঙ্গেলের আত্মোৎসর্গের জলন্ত দৃষ্টান্ত দেখিয়া মুগ্ধ হইয়াছিল, তিনি তাঁহার কীর্ত্তিক্ষেত্র ক্রিমিয়া হইতে গৃহে ফিরিলে, ইংলণ্ড তাঁহাকে ৫ লক্ষ টাকা তাঁহাদের হৃদয়ের কৃতজ্ঞতার চিহ্নস্বরূপ উপহার দিল। কিন্তু তিনি নিজে তাহা গ্রহণ করিলেন না, অবশেষে সেই অর্থে আমরা পূর্ব্বে যে "নাইটীঙ্গেল আশ্রম" এর কথা উল্লেখ করিয়াছি, ফ্লোরেন্স্ নাইটীঙ্গেলের নাম চিরস্মরণীয় করিবার জন্য, সেই "নাইটীঙ্গেল আশ্রম" স্থাপিত হইল। রোগীর সেবা শুশ্রূষা কি প্রকারে করিতে হয় প্রতিদিন শত শত রমণী এখানে সেই শিক্ষা পাইতেছেন; এবং দেশে বিদেশের হাঁসপাতালে যাইয়া রোগীর সেবা শুশ্রূষায় জীবন সমর্পণ করিয়া নাইটীঙ্গেলের গৌরব ঘোষণা করিতেছেন।

পবিত্র-ব্রতে যাঁহারা জীবন উৎসর্গ করিয়াছেন, তাঁহারা স্বদেশ বিদেশ জানেন না। যেখানে দুঃখীর আর্ত্তনাদ, সেই দিকেই তাঁহাদের করুণাপূর্ণ-হৃদয় ধাবিত হয়। এদেশে বেহার অঞ্চলের কৃষকদিগের শোচনীয় দরিদ্রতার কথা যখন ইংলণ্ডে পৌঁছিল, যখন কোমল হৃদয়া রমণী নাইটীঙ্গেল শুনিলেন যে, বেহারের প্রজাগণ কখনও বা অনাহারে কখনও বা অর্দ্ধাহারে আবার কখনও বা গাছের পাতা বা ফল মূল খাইয়া জীবন রক্ষা করিতেছে, তখন তিনি এবিষয় লইয়া ইংলণ্ডে মহা আন্দোলন উপস্থিত করিলেন। তাঁহার বড় আকাঙ্ক্ষা ছিল এদেশে আসিয়া ভারতীয় প্রজার দুঃখ দুর্দ্দশা স্বচক্ষে দেখিয়া, তাহাদের ক্লেশ দূর করিবেন, কিন্তু তাঁহার আশা পূর্ণ হইল না। তিনি এখন একান্তই পীড়িত হইয়া পড়িয়াছেন। রোগীর সেবায় তাঁহার দেহ এমনই ভগ্ন হইয়াছে, যে স্বদেশ পরিত্যাগ করা তাঁহার পক্ষে এখন অসম্ভব।

নাইটীঙ্গেলের বয়স এখন ৬৮ বৎসর হইয়াছে। তিনি সাংঘাতিক পীড়ায় আক্রান্ত—ইহাতে কে না চিন্তিত হইবেন? ইহাঁর মৃত্যুতে ইংলণ্ড একটী রত্ন হারাইবেন। আমরা নাইটীঙ্গেলের জীবনী শেষ করিলাম। করুণার প্রতিমূর্ত্তি আত্মোৎসর্গের জলন্ত দৃষ্টান্ত, পরোপকার-ব্রতপরায়ণা ফ্লোরেন্স্ নাইটীঙ্গেলের জীবনী পড়িয়া পাঠক পাঠিকাদিগের মনে কি কোন আশা—কোন আকাঙ্ক্ষার উদয় হইবে?

---

# ভাই বোন্।

## ২য় পরিচ্ছেদ।

বসু বাবু এবং তাঁহার স্ত্রী শয়ন করিলেন বটে কিন্তু তাঁহাদের চিন্তার হ্রাস হইল না। ছেলে মেয়েরা এখন ঘুমাইয়াছে সুতরাং তাঁহারা নিঃসঙ্কোচে ভাবী বিপদের বিষয়ে কথা বার্ত্তা বলিতে লাগিলেন।

বাহিরে ঘোর অন্ধকার। সে অন্ধকারে যেন সংসারের সকল সম্বন্ধ ডুবিয়া গিয়াছে। বাহিরের কোন পদার্থই দৃষ্টিগোচর হয় না। কেবল বায়ুর স্বন্ স্বন্ শব্দ শুনা যাইতেছে। বসু বাবু এবং তাঁহার গৃহিণী সেই অন্ধকারপূর্ণ পৃথিবীতে নিঃসহায় হইয়া কি ভাবিতেছেন? সেখানে তাঁহাদের বিশেষ আত্মীয় কেহ নাই। বিদেশে কাহারাই বা থাকে? কর্ম্মোপলক্ষে দশ স্থানের দশ জনের সঙ্গে আলাপ পরিচয় হইয়াছে মাত্র। আজ এই বিপদের দিনে সকলেই আপন আপন পুত্র পরিবার লইয়া ব্যস্ত। কিন্তু এই ঘোর বিপদের সময়েও বসু বাবু অধীর হন্ নাই। তিনি মধ্যে মধ্যে বলিতেছেন "আমাদের নিকটে যদি একখানা নৌকা থাকিত তবে অনেককে বাঁচাইতে পারিতাম"। "আমাদের ছাদের উপর উঠিয়া অনেকে বাঁচিতে পারিত।" ইত্যাদি। তাঁহার বিশ্বাস ছিল যে জল ছাদের চাইতে বেশী উচু হইবে না। কিন্তু তাঁহার স্ত্রী প্রথমেই নিরাশ হইয়াছিলেন। তিনি বলিলেন "দেখ, আজ আর রক্ষা নাই। সমুদায়ই জলে ভাসিয়া যাইবে। ছাদের উপর উঠিলেও নিস্তার নাই; তবু আমাদের যাহা সাধ্য প্রাণপণে ছেলে মেয়েদের রক্ষা করিতে চেষ্টা করিব। আমি খোকাকে লইয়া ভাসিব। তুমি কি কুসুম ও ননীকে দেখিতে পারিবে না? কিন্তু তাহা অসম্ভব। জলের স্রোতে কে কোথায় যাইবে স্থিরতা কি? আমি মরিয়া যদি তোমাদিগকে বাঁচাইতে পারিতাম। ঈশ্বর কি তাহা করিবেন?—

এই কথা বলিতে বলিতে তাঁহার চক্ষে জল আসিল। সস্নেহে একবার সন্তানদিগের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন। তখন সে হৃদয়ের আবেগ কে বোধ করিতে পারে? মাতার স্নেহের নিকট রমণীর ধৈর্য্য পরাজিত হইল। দরবিগলিত ধারে চক্ষের জল পড়িতে লাগিল। তিনি উন্মত্তের ন্যায় ক্ষুদ্র শিশুটিকে ক্রোড়ে লইয়া বলিলেন—

"চল, সময় থাকিতে আমরা ছাদে উঠি। বাহিরে ঐ জলের শব্দ শুনা যাইতেছে।"

বসু বাবু—"ও বাতাসের শব্দ; জলের শব্দ নয়। তুমি স্থির হও, বিপদে একমাত্র ঈশ্বরই ভরসা। তিনিই আমাদিগকে রক্ষা—

সহসা ননী ঘুমের মধ্যে "জল জল" বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল। পিতা মাতা শশব্যস্তে নিকটে গিয়া কারণ জিজ্ঞাসা করাতে ননী বলিল "আমি স্বপ্নে দেখ্‌ছিলাম যেন আমি ও দিদি জলে ভাসিয়া যাইতেছি।" বসুবাবু ছেলেকে সান্ত্বনা করিয়া বলিলেন,—

"তোমরা স্থির হ'য়ে থাক, আমি দেখিতেছি বাহিরে জল হইয়াছে কি না।" এই বলিয়া ঘরের দোর খুলিয়া লণ্ঠন হাতে বাহিরে আসিয়া যাহা দেখিলেন তাহাতে তাঁহার পা আর অগ্রসর হইল না। ফিরিয়া ঘরে এসে বলিলেন "প্রস্তুত হও এখনই আমরা ছাদের উপরে উঠিব। ছেলে মেয়েদের জন্য কিছু খাবার লয়ে উঠা উচিত।

কে জানে কতক্ষণ এইভাবে থাকিতে হইবে? আর কিছু সঙ্গে লইবার আবশ্যক নাই যদি ঈশ্বর রক্ষা করেন তবে সকলি থাকিবে।"

একথা শুনিয়া মাতা বুঝিলেন বাহিরে জল আসিয়াছে এবং জলের শব্দে বাতাসের শব্দ মিশিয়া এত সোঁ সোঁ করিতেছে। মুহূর্ত্ত কাল নিশ্চেষ্ট প্রায় থাকিয়া কুসুমকে উঠাইলেন এবং স্নেহে সজল চক্ষে সন্তানদিগকে চুম্বন করিলেন। মনে হইল "এজন্মে আর এমন সুখ ঘটিবে না।'

বসু বাবুর আদেশ মত খাদ্য দ্রব্য এবং লণ্ঠনে বাতি জ্বালাইয়া সকলে ঘরের বাহির হইলেন। তখন উঠানে জল আসিয়াছে। নিঃশব্দে ধীরে ধীরে সকলে ছাদের উপর উঠিল। প্রদীপ অনেকক্ষণ রহিল না। বাতাসের অনুগ্রহে শীঘ্রই নির্ব্বাপিত হইল। তখন আবার সেই অন্ধকার। নীচে ধবলাকৃতি জল তর তর শব্দে চলিতেছে। সে জল যেন সমুদ্রের দূত স্বরূপ হইয়া সকলকে বলিতেছে "তোমরা সকলেই সেই অতল সমুদ্রের গর্ভে যাইবে। তবে কেন বৃথা চেষ্টা করিতেছ? ছাদের উপর যাও, গাছের উপর যাও, কোথায়ও নিস্তার নাই। প্রবল পরাক্রান্ত সমুদ্রের বেগ কে রোধ করিবে? আজ সকলে সমান; ধনী দরিদ্রের বিভিন্নতা নাই; উচ্চ নীচের তফাৎ নাই। আজ সকলেরই এক দশা এক গতি।"

ক্রমশঃ।



# সাজি।

মানুষই কি রাক্ষস?— মানুষের কিছুতেই তৃপ্তি নাই, 'যত পাই তত খাই।' এক ব্যক্তি বলিয়াছিল যে, পৃথিবীর যাবতীয় পদার্থের মধ্যে সে দুটী জিনিষ খায় না। একটী, স্থলচরের মধ্যে—ঘুড়ী, আর একটী জলচরের মধ্যে—নৌকা। চিনেরা আরসুলা অত্যন্ত উপাদেয় বলিয়া ভক্ষণ করে। ফরাসী, ইংরাজ এবং কোন কোন বাঙ্গালী বাবুদের মধ্যে, ভেকের 'বট্‌লেটের' বড় আদর, সংবাদ পত্রে দেখিলাম ফরাসীর দেশে সম্প্রতি একটী ভেক ৭০০৲ টাকায় বিক্রয় হইয়াছে, ভেক মহাশয়ের দেহের আয়তন দুই হস্ত এবং ওজন ৩০।৩৫ সের। এই বাঙ্গালা দেশের কোন কোন অঞ্চলে গুগ্‌লির আদর কম নহে। দেখিতে পাওয়া যায় যে প্রায়ই এই প্রকার একটী না একটী ঘৃণিত পদার্থ এক একটী জাতির প্রিয় খাদ্য। এই যখন সভ্য জাতিদের কথা, অসভ্য জাতির কথা বলিবার অল্প আবশ্যক নাই; তাহারা কিছুই বাদ দেয় না। কীট পতঙ্গ হইতে আরম্ভ করিয়া, জীব জগতের শ্রেষ্ঠ জীব মানুষ পর্য্যন্ত ইহারা আহার করে। বাস্তবিক ভাবিতে গেলে মানুষকে রাক্ষস বলিয়া মনে হয়, বৃক্ষ, লতা, পাতা, ফুল হইতে আরম্ভ করিয়া, কীট পতঙ্গ এবং বৃহৎ বৃহৎ জন্তু, এ সকলেই মানুষের উদর জ্বালা নিবারণ এবং রসনা পরিতৃপ্ত করে, সৃষ্টির কিছুই ইহাদের কাছে বাদ যায় না। প্যারিসে সম্প্রতি ঘোড়ার মাংসের আদর দিন দিন বাড়িতেছে। ধনীরা বলেন কেবল গরীব লোকেই ঘোড়ার মাংস খায়; কিন্তু ছুই লোকেরা

বলে যে অনুসন্ধান করিলে ধনীদের বন্ধনশালা হইতেও প্রচুর ঘোড়ার মাংস বাহির হইতে পারে। এক প্যারিসেই দেড়শত ঘোড়ার কসাই আছে। দশবৎসরে ঘোড়া খাওয়া কত বাড়িয়াছে দেখ, ১৮৮৬ সালে সমস্তশুদ্ধ ৮৬২টী ঘোড়া বধ করা হয়, কিন্তু ১৮৮৭ সালে ১৫০০০ পোনের হাজার ঘোড়ার আবশ্যক হইয়াছিল। ছেলেবেলা যখন রাক্ষসের গল্প শুনিতাম, তখন মনে করিতাম, রাক্ষস যেন কি এক প্রকার বিস্তৃত কিমাকার প্রকাণ্ড জীব দেখিয়া শুনিয়া ক্রমে সে ভ্রম দূর হইতেছে।

* * * * * *

**প্রকৃতির বায়ুমাণ যন্ত্র**—লজ্জাবতী লতা তোমরা অনেকেই দেখিয়াছ? লতাটী ছুঁইলেই সরমে লজ্জায় একেবারে সঙ্কুচিত হইয়া পড়ে। সম্প্রতি ভিয়েনা নগরে যে পুষ্প প্রদর্শনী হইয়া গিয়াছে, তাহাতে এই ধরণের একটী উদ্ভিদ্ প্রদর্শিত হইয়াছে; তফাৎ এই যে মানুষের স্পর্শেই যে কেবল ইহার লজ্জার চিহ্ন দেখিতে পাওয়া যায় তাহা নহে, ঝড় বৃষ্টি প্রভৃতিতেও ইহার লজ্জা প্রকাশ পায়। ঝড়, বৃষ্টি, ভূমিকম্প প্রভৃতি ঘটিবার ৪৮ঘণ্টা পূর্ব্বে ইহার পাতাগুলি পরস্পর সংলগ্ন হইয়া যায়। সুতরাং ঝড় বৃষ্টি প্রভৃতি কখন হইবে, ইহা দ্বারা তাহা পূর্ব্বেই জানা যায়। মানুষ বুদ্ধি চালনা করিয়া বারমেটার নামক যন্ত্র আবিষ্কার করিয়াছে; তাহা দ্বারা ঝড় বৃষ্টির সময় অনেকটা ঠিক জানিতে পারা যায়। ঈশ্বরের সৃষ্টির মধ্যেও যন্ত্রের অভাব নাই। আমাদিগের চক্ষু নাই, তাই সকল সময় দেখিতে পাই না।

* * * * * *

**বিষতরু**—যবদ্বীপে একপ্রকার বৃক্ষ আছে, তাহার সম্বন্ধে অদ্ভুত কথা শুনিতে পাওয়া যায়। বৃক্ষটী দেখিতে অতি সুন্দর, কিন্তু ইহার কাছে যে যায় সেই মরে। এই বৃক্ষের চতুষ্পার্শ্বে নয় দশ মাইলের মধ্যে কোন বৃক্ষাদি জন্মিতে পারে না, পক্ষীরা মাত্র থাকিতে পারে না কোন জীব নিকটে যাইতে পারে না, গেলে মুহূর্ত্তে তাহাকে প্রাণ হারাইতে হয়। এই বৃক্ষ হইতে অবিশ্রান্ত এক প্রকার বিষ নির্গত হইয়া, চারিদিকের বায়ু বিষাক্ত করিতেছে। এই বিষাক্ত বায়ু যে স্থান দিয়া চলে, সে স্থানের সমস্তই ধ্বংস হইয়া যায়। পাখীর শরীরে এই বিষাক্ত বায়ু লাগিলে তৎক্ষণাৎ তাহার মৃত্যু হয়। এই বৃক্ষের চারিদিক মানুষের অস্থিতে পরিপূর্ণ। এই বৃক্ষ অতি প্রকাণ্ড, পঞ্চাশ হাতেরও অধিক উচ্চ, বৃক্ষের পরিধি পঁচিশ হাতের কম নহে। ইহার ছাল সাদা; এই ছালে আঘাৎ করিলে এক প্রকার সাদা রস নির্গত হয়, তাহা সাপের বিষ হইতেও ভয়ঙ্কর। এই বিষে কেবল যে জীবের প্রাণ নাশ হয় তাহা নহে, ইহাতে অনেক উৎকট পীড়াও আরোগ্য হইতে পারে,—বিষে বিষক্ষয়।

* * * * * *

**আশ্চর্য্য জীবনরক্ষা**— আমির আলী তিনজন সঙ্গী লইয়া মাছ ধরিতে গিয়াছিল। আমির আলীর বাড়ী চট্টগ্রাম অঞ্চলে, এই অঞ্চলের অনেক জেলেরা, খুলনা জেলার দক্ষিণে সুন্দর বনে মাছ ধরিতে আসিয়া থাকে। আমির আলী জাল প্রভৃতি লইয়া সঙ্গীদের সহিত নৌকা ছাড়িয়া দিল; তখন ঝড় বৃষ্টির কোন চিহ্ন ছিল না। তাহারা ধীরে ধীরে নিশ্চিন্তমনে সমুদ্রতীর দিয়া বাহিয়া যাইতেছে, এমন সময় হঠাৎ জোরে বাতাস উঠিল, এবং বাতাসের জোরে তাহাদের নৌকাও ক্রমে গভীর সমুদ্রের দিকে চলিল। তাহারা চারিজনে প্রাণপণে নৌকা ফিরাইবার চেষ্টা করিতে লাগিল, সমস্ত রাত্রি এবং তার পর দিন দুইপ্রহর পর্য্যন্ত

অবিশ্রান্ত দাঁড় টানিতে লাগিল; কিন্তু তাহাতে ফল হইল না। তখন তাহারা হতাশ হইয়া হাল ছাড়িয়া দিল, নৌকাও যে দিক ইচ্ছা চলিতে লাগিল। ইহাদের সহিত কোন খাবার জিনিষ ছিল না, ভাবিয়াছিল নিকটেই মাছ ধরিয়া যাহা উপার্জ্জন করিবে, তাহাতেই খাবার চালাইবে; এ বিপদ যে হইবে তাহারা ত আগে বুঝে নাই। ক্ষুধায় এবং পীপাসায় একে একে আমির আলীর সঙ্গীরা মরিতে আরম্ভ করিল। অবশেষে বাড়ী হইতে বাহির হইবার ১৬ দিন পরে আণ্ডামান দ্বীপের নিকট ইহাদের নৌকাখানা এক খানা জাহাজের সম্মুখে পড়ে। জাহাজের লোকেরা দেখিল যে নৌকার একটা লোক মৃতপ্রায় অচৈতন্য হইয়া পড়িয়া আছে, আর তিন জনের দেহ পচিয়া ভুষ হইয়াছে। অনেক সেবা শুশ্রূষার পর আমির আলী এখন বাঁচিয়াছে, সে বলে ১৫ দিন পর্য্যন্ত সে সজ্ঞানে ছিল, তার পর সে জ্ঞান শূন্য হয়। যে ১৫ দিন সজ্ঞানে ছিল, সমুদ্রের লোণা জল ভিন্ন সে ১৫ দিন সে আর কিছুই খায় নাই। তিনটী মৃত শব কোলে করিয়া ১৫ দিন পর্য্যন্ত অকূল সাগরে ভাসিয়া ভাসিয়া বেড়াইয়াছে। আমির আলী মৃত্যুর হাত হইতে এইরূপে আশ্চর্য্য ভাবে রক্ষা পাইয়া এখন গৃহে ফিরিয়াছে। তাহার গৃহে আজ কত আনন্দ!

* * * * *

**বিজ্ঞানের কথা**— তারে যে সংবাদ পাঠান যায় তাহার দিন দিনই উন্নতি হইতেছে। ইহার এক প্রকার সংকেত আছে, তাহা দ্বারাই কথা বুঝা যায়। কিন্তু সম্প্রতি রয়ান সোসাইটী নামক বিজ্ঞান সভায় রবার্টসন নামক একজন সাহেব, টেলিগ্রাফ দ্বারা এক স্থান হইতে আর একস্থানে, হাতের লেখা পর্য্যন্ত পাঠাইবার উপায় বাহির করিয়াছেন। ইহা যতদূরে ইচ্ছা পাঠান যাইতে পারে, এবং যে প্রকার হাতের লেখা, অবিকল তাহাই হইবে। বড়ই সুবিধা; টেলিফোনের সাহায্যে দূরে থাকিয়াও আত্মীয় স্বজন, প্রিয়জনের সহিত কথা বলা যায়, আবার এই নূতন রীতিতে টেলিগ্রাফ প্রচলিত হইলে, দূরদেশে বসিয়াও, মুহূর্ত্তে আত্মীয় স্বজনের হাতের লেখা দেখিতে পাওয়া যাইবে। বিজ্ঞানের দিন দিন কতই উন্নতি হইতেছে। এক রকম যন্ত্র হইয়াছে; তাহাতে মানুষের কথা জীবিত রাখা যায়। অর্থাৎ আমি এখন যে কথা বলিতেছি, যদি সেই যন্ত্রে এই কথাগুলি কেহ ধরিয়া রাখে; তাহা হইলে আমার মৃত্যুর পর এমন—কি সহস্র বৎসর পরেও, সেই যন্ত্রের সাহায্যে আমার কথা শুনা যাইতে পারে। ইহাতে গলার স্বর অবিকল থাকিয়া যায়। গান পর্য্যন্ত ইহা দ্বারা রক্ষা করা যায়। এক ব্যক্তি লক্ষ্ণৌ বসিয়া যে গান গাহিতেছে, তুমি ইচ্ছা করিলে, তোমার বিছানায় শুইয়া শুইয়া সে গান শুনিতে পার।

---

## পত্র প্রেরকদের প্রতি।

শ্রীহীরালাল ঘোষ, বোয়ালীয়া। চিম্‌নী ব্যতীত কেরোসীন ল্যাম্প ব্যবহার করিলে স্বাস্থ্যের হানি হয়। ইহার ধোঁয়া নিশ্বাস প্রশ্বাস দ্বারা শরীর মধ্যে প্রবেশ করিলে রোগ জন্মাইতে পারে; এই জন্য ডোম এবং চিম্‌নিওয়ালা ল্যাম্প ব্যবহার করা উচিত। কেরোসীন ল্যাম্পের আলো বড় উগ্র, চোখের সাম্‌নে রাখিয়া কাজ কর্ম্ম করিলে চক্ষুর দৃষ্টি শক্তি কমিয়া যায়।

ডাক্তার সণ্ডার্স্ সাহেব বলিয়াছেন যে ডোম-ওয়ালা ডবল উইক্ ল্যাম্প পেছন দিক রাখিয়া সমুদয় কাজ কর্ম্ম করিলে চোখের দৃষ্টি শক্তি কমে না।

---




জুলাই, ১৮৮৮।

# উদারতা।

বহুকাল পূর্ব্বে চীনদেশে নাথান নামে জনৈক সম্ভ্রান্ত বংশীয় ধনপতি বাস করিতেন। তিনি অতি উদারচেতা ছিলেন। যাহাতে আপন আলয়ে খ্যাতিমান ব্যক্তিদিগকে ভদ্রজনোচিত আদর অভ্যর্থনা করিতে পারেন তজ্জন্য এমন সুবৃহত সুন্দর সুন্দর অট্টালিকা নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন যে, সেরূপ প্রাসাদ তখন পৃথিবীতে কুত্রাপিও দৃষ্ট হইত না। তাঁহার বহুসংখ্যক অনুচরবর্গ ছিল। তাঁহার গৃহ দিবারাত্র আগন্তুক ব্যক্তিদিগের অতিথিসৎকারের জন্য উন্মুক্ত থাকিত। তাঁহার যশোসৌরভে পূর্ব্ব পশ্চিম পরিপূর্ণ ছিল।

যখন তিনি বার্দ্ধক্যদশায় উপনীত হইয়াছিলেন অথচ তাঁহার বদান্যতা অক্ষুণ্ণ ছিল, তখন নিকটস্থ প্রদেশের কোন ভদ্র যুবকের কর্ণে তাঁহার যশের কথা প্রবেশ করে। অপনাকে নাথানের সমতুল্য ঐশ্বর্য্যশালী বিবেচনা করিয়া নাথানের যশ ও সদাশয়তার প্রতি যুবকের হিংসা জন্মে এবং অধিকতর বদান্যতায় তাঁহাকে অতিক্রম করিতে মনস্থ করে। নাথানের প্রাসাদের অনুরূপ আপন প্রাসাদ নির্ম্মাণ করে, এবং প্রত্যেকের প্রতি এমন সৌজন্য ও দয়া প্রকাশ করে যে শীঘ্রই চতুর্দ্দিকে তাহার খ্যাতি বিস্তৃত হইয়া পড়িল। যুবক একদা আপনি প্রাসাদপ্রাঙ্গনে বসিয়া আছে এমন সময়ে একজন বৃদ্ধা প্রাসাদের একদ্বারে ভিক্ষার্থে আসিয়া সেখানে ভিক্ষা প্রাপ্ত হইলে দ্বিতীয়দ্বারে ভিক্ষার্থে গমন করে। সেখানে ভিক্ষা লইয়া তৃতীয়দ্বারে যায়। এইরূপে দ্বাদশদ্বারে ভিক্ষা লইয়া যখন ত্রয়োদশদ্বারে উপস্থিত হইয়াছে তখন যুবক বৃদ্ধাকে সম্বোধন করিয়া বলিল "তুমি বড় ক্লেশকর হইয়া উঠিতেছ", তথাপি বৃদ্ধা ভিক্ষা পাইতে বঞ্চিত হইল না।

বৃদ্ধা বলিল "আহা! নাথানের কি অপরিসীম বদান্যতা, তাঁহার দয়া কি প্রশংসনীয়, তাঁহার প্রাসাদে যে বত্রিশটী দ্বার আছে আমি সকল দ্বারেই ভিক্ষার্থে উপস্থিত হইয়াছি এবং কোন দ্বারেই আমার যাচ্ঞা বৃথা হয় নাই। এখানে আমি কেবল ত্রয়োদশবার আসিয়াছি এবং ইহাতেই আমি তিরস্কৃত হইলাম"! এই বলিয়া বৃদ্ধা সেখান হইতে প্রস্থান করিল, আর কখনও তথায় যায় নাই।

যুবক মনে মনে অত্যন্ত কুপিত হইল। নাথানের কোন প্রশংসা তাহার নিকট স্বীয় যশের হানী বলিয়া বোধ হইত। যুবক মনে মনে এইরূপ চিন্তা করিতে লাগিল যে "যখন আমি সামান্য সামান্য বিষয়েই নাথান অপেক্ষা অনেক গুণে নিকৃষ্ট তখন

তাহাকে সদাশয়ে পরাভব করা দূরে থাক্, মহত্তর বিষয়ে কিরূপে তাহার সমকক্ষ হইব? যদি সংসার হইতে তাহাকে অপসৃত না করি আমার সমস্ত পরিশ্রম বৃথা হইবে। বার্দ্ধক্য যখন তাহাকে মৃত্যু মুখে আনয়ন করিতে পরিতেছে না, আমি এখন স্বীয় হস্তে তাহা করিব"। আপনার এই মনোভাব কাহাকেও ব্যক্ত না করিয়া, সঙ্গে কতিপয় অনুচর লইয়া অশ্বারোহণ করিয়া নাথানের গৃহাভিমুখে গমন করিল। তৃতীয় দিবসে তথায় উপস্থিত হইয়া, ভৃত্যদিগকে তাহাদের বাসস্থান অন্বেষণ করিয়া লইয়া তাহার আদেশ না প্রাপ্ত হওয়া পর্য্যন্ত তথায় উপস্থিত থাকিতে বলিল।

সন্ধ্যার সময়ে যুবক একাকী অশ্বারোহণে নাথানের গৃহাভিমুখে গমন করিতে করিতে নাথানকে অতি সামান্য বেশে অনতিদূরে দেখিতে পাইল। তাঁহাকে নাথানের কোন ভৃত্য মনে করিয়া নাথানের গৃহ দেখাইয়া দিতে বলিল।

নাথান উত্তর করিলেন "মহাশয় আমার সহিত আগমন করুন, আমি নাথানের গৃহে লইয়া যাইব। যুবক বলিল, "আমি বড় বাধিত হইলাম, কিন্তু আমার ইচ্ছা যে নাথান আমাকে দেখিতে না পান এবং আমি যে এখানে আসিয়াছি তাহাও না জানিতে পারেন"। "এইরূপ যদি আপনার অভিপ্রায় হয়, তাহার উপায়ও আমি করিতে পারি"। যুবক অশ্ব হইতে অবতরণ করিলে দুইজনে হৃষ্টমনে আলাপাদি করিতে করিতে নাথানের প্রাসাদে উপস্থিত হইলেন। নাথান আপনার একজন ভৃত্যকে অন্তরালে ডাকিয়া বলিয়া দিলেন তিনি যে নাথান তাহা ঐ গৃহের কাহারও নিকট হইতে যুবক যেন জানিতে না পারে। নাথান যুবককে এক বৃহৎ সুসজ্জিত প্রকোষ্ঠে লইয়া গেলেন। তথায় তাহার পরিচর্য্যার নিমিত্ত ভৃত্যাদি নিযুক্ত করিয়া দিলেন, এবং স্বয়ং তাঁহার সহিত সর্ব্বক্ষণ থাকিয়া মিষ্ট আলাপাদি করিয়া যুবকের মনস্তুষ্টি করিতে লাগিলেন।

অনেকক্ষণ পরে যুবক নাথানকে তাঁহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিলেন "মহাশয় আমি নাথানের একজন নিকৃষ্ট কর্ম্মচারী। ইহাঁর অধীনে কর্ম্ম করিতে করিতে বৃদ্ধ হইয়া গেলাম, তথাপি ইহাপেক্ষা উচ্চতর পদে অদ্যাপি আমার উন্নতি হইল না। সকলেই আমার প্রভুর গুণকীর্ত্তন করে, কিন্তু আমি তাঁহার প্রশংসার কিছুই দেখি না"। এই কথা শুনিয়া যুবক ভাবিতে লাগিল যে, এই কর্ম্মচারীদ্বারা আমার দুষ্ট ইচ্ছা সহজেই সাধিত হইতে পারিবে। নাথান যুবককে সসম্ভ্রমে তাঁহার পরিচয় এবং আগমনের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন এবং আবশ্যক হইলে সাধ্যানুসারে সৎপরামর্শ ও অন্যান্য উপায়ে তাহাকে সাহায্য করিবেন বলিয়া অঙ্গীকার করিলেন। যুবক তাহার আগমনের অতিশয় গোপনীয় উদ্দেশ্য এবং তাহা যেন কাহারও নিকট প্রকাশিত না হয় ইত্যাদি বলিয়া অনেক ইতস্ততের পর মনোভাব পরিব্যক্ত করিল।

যুবকের এই ঘৃণাকর মনস্থ শ্রবণ করিয়া নাথান মনে মনে অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হইলেন বটে কিন্তু বাহ্যিক লক্ষণে কিছুমাত্র অন্তরের ভাব প্রকাশ না করিয়া ধীর ভাবে বলিলেন—

"আপনার পিতা অতিশয় সদাশয় ব্যক্তি ছিলেন, আপনি সকল লোকের প্রতি দয়াপরবশ হইয়াছেন, আপনার উদ্দেশ্য মহৎ। আপনার কথা অতি গোপনে রাখিব। দেখুন এখান হইতে উত্তরদিকে প্রায় অর্দ্ধক্রোশ দূরে একটী বন আছে, সেই বনে প্রত্যহ প্রাতে নাথান একাকী ভ্রমণ করিতে যান। সেইখানে যদি তাঁহাকে হত্যা করিতে পারেন, তবে অন্যপথে আপন আলয়ে নির্ব্বিঘ্নে চলিয়া যাইবেন।

যুবক এই কথা শুনিয়া হর্ষোৎফুল্ল মনে তথা হইতে চলিয়া আসিয়া আপন ভৃত্যদিগকে প্রস্তুত থাকিতে বলিলেন। পরদিবস প্রত্যুষে নাথান আপন মৃত্যু চিন্তা করিতে করিতে সেই বনাভিমুখে গমন করিলেন। বনে উপস্থিত হইবামাত্র যুবক তরবারি হস্তে করিয়া নাথানের ঘাড় ধরিয়া বলিল "রে নীচাশয় আজ তোর মরণ নিশ্চয়"—নাথান উত্তর করিলেন "তবে আমি নিশ্চয়ই বিনষ্ট হইবার উপযুক্ত"। যুবক তাঁহার স্বর শুনিয়া মুখের দিকে অবলোকন করিয়া দেখেন যে, যিনি তাঁহাকে এত যত্ন করিয়া তাঁহার জীবনে জ্ঞান দিয়াছেন এত মিষ্ট কথা বলিয়া তাঁহাকে তুষ্ট করিয়াছেন ইনি সেই ব্যক্তি। তখন লজ্জায় ও দুঃখে হতবুদ্ধি হইয়া গেল। তৎপরে সাশ্রুনয়নে তাঁহার চরণতলে পতিত হইয়া বলিলঃ—"পিতঃ আপনার উদরতার বিশেষ পরিচয় পাইয়াছি, আমার ন্যায় পাষণ্ড আর জগতে নাই। আমি পশু হইতেও অধম। আমার পাপের সমুচিত প্রতিফল প্রদান করুন।" নাথান বলিলেন বৎস কিছুমাত্র উদ্বিগ্ন হইও না; তুমিত সদ্গুণে আমা অপেক্ষা বড় হইতে অভিলাষ করিয়াছিলে, আমার প্রতি অনর্থক ঘৃণা বশতঃ এরূপ কর নাই। তোমার অন্তঃকরণ অতি মহৎ। যুবক অধিকতর অনুতপ্ত হইল। নাথান বলিলেন "অদ্য আমার কি শুভদিন ছিল অদ্যাবধি এমন কেহ আমার নিকট আইসে নাই যাহাকে আমি সাধ্যানুসারে সন্তুষ্ট করিতে চেষ্টা না করিয়াছি। আমার প্রাণ লইতে তোমার ইচ্ছা হইয়াছিল, পাছে তুমি নিরাশ হইয়া ফিরিয়া যাও এই ভয়ে আমি জীবন দিতে আসিয়াছি। বহুকাল সুখভোগ করিয়া বৃদ্ধ হইয়াছি আর অতি অল্পকালই জীবিত থাকিব, তুমি আমার সমস্ত ঐশ্বর্য্যের অধিকারী হও তোমা অপেক্ষা আর উপযুক্ত পাত্র কোথায় পাইব।" যুবক লজ্জা, দুঃখ ও অনুতাপে অধিকতর কষ্ট পাইতে লাগিল; নাথান তাহাকে অনেক স্নেহ-বাক্যে সান্ত্বনা দিলেন। যুবক বুঝিতে পারিলেন তিনি কখনও নাথানের তুল্য হইতে পারিবেন না। এবং নাথানের পদধূলি মস্তকে লইয়া ধন্যবাদ দিতে দিতে আপন গৃহে ফিরিয়া আসিলেন।



## আলোক-বিজ্ঞান।



আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি এবং তোমরাও বেশ জান যে, জল, কাচ, অভ্র প্রভৃতি অনেকগুলি জিনিষ আছে যার ভিতর দিয়া সব দেখা যায়। অর্থাৎ তাদের ভিতর দিয়া আলো সহজে গমনাগমন করিতে পারে। ইহারা স্বচ্ছ পদার্থ। আমরা বলিয়াছিলাম আলোর পথে বাধা পড়িলেই আলো অন্য পথে যায়। অনচ্ছ পদার্থ আলোর পথে যেমন বাধা দেয় স্বচ্ছ পদার্থ ততদূর না হউক কিয়ৎ পরিমাণে বাধা দেয়। কোন স্বচ্ছ পদার্থের উপর যখন আলোকরশ্মি ঠিক সোজা বা খাড়া হ'য়ে (জ্যামিতিতে যাকে লম্ব বলে) না পড়ে

যদি হেলে বা কাৎ হয়ে এসে পড়ে, তবে যে দিকে যাইতেছিল ঠিক সেই দিকে না গিয়া তাহার পার্শ্ব দিয়া সরিয়া অন্যদিকে যায়। ইহাকে আলোর গতির দিক্-পরিবর্ত্তন বা বক্র-গতি বলে। যখন একই পদার্থের ভিতর দিয়া আলোক গমন করে তখন সরল পথে যায়। কিন্তু যখন এক পদার্থের ভিতর হইতে অন্য প্রকার পদার্থের ভিতর প্রবেশ করিতে যায় তখনই অন্য দিকে বাঁকিয়া যায়।



উপরের চিত্র দেখিলে বেশ বুঝিতে পারিবে। ক খ থ জলের উপরিভাগ, গ ঘ আলোক-রশ্মি বাতাসের ভিতর হইতে জলের ভিতর যাইতেছে। ঘ-র নিকট আসিয়া যে দিকে যাইতেছিল সেদিকে যাইতে না পারিয়া ঘ ড-র দিকে বাঁকিয়া গেল। ঠিক যেন বোধ হইতেছে গ ড-ঘর নিকট ভাঙ্গিয়া গিয়াছে।

গ-র নিকট হইতে আলো আসিয়া ঘ-এ পড়িলে যেমন ড-র দিকে বাঁকিয়া যায় অর্থাৎ চছ লম্বর দিকে আসে, কম কাত্ হয় বা খাড়া হইতে চেষ্টা করে, সেইরূপ ড-র দিক হইতে আলো আসিয়া যদি ঘ-এ পড়ে তবে তাহা গ-র দিকে বাঁকিয়া যাইবে অর্থাৎ চ ছ লম্ব হইতে দূরে সরিয়া যায় বা অধিকতর হেলিয়া পড়ে। এখন এই কথা স্মরণ রাখিবে যে, জলের ভিতর হইতে বাতাসের ভিতর বা এক পদার্থের ভিতর হইতে তদপেক্ষা কম ঘন কোন পদার্থের ভিতরে যাইবার সময়ে অধিকতর কাত হইয়া যায়। আর বাতাসের ভিতর হইতে জলের ভিতরে বা এক পদার্থের ভিতর হইতে তদপেক্ষা অধিকতর ঘন কোন পদার্থের ভিতর যাইবার সময়ে কম কাত হইয়া যায়। (কিন্তু তার্পিণ তেলের বেলায় এ নিয়ম খাটে না। তার্পিণ তৈল অপেক্ষা জল যদিও বেশী ঘন তথাপি জলের ভিতর হইতে তার্পিণ তেলের ভিতর আলো গমন কালে কম কাত্ হইয়া যায়।) সকল স্বচ্ছ পদার্থে আলোক সমান বাঁকে না। জলে যতটা বাঁকে কাঁচে তদপেক্ষা অধিক বাঁকে, হীরকে আরও অধিক বাঁকে, তেলে কম বাঁকে। এইগুণে কাচ ও হীরক বিলক্ষণ প্রভেদ করা যায়। কিন্তু একই পদার্থে বাঁকের পরিমাণ সমান থাকে।

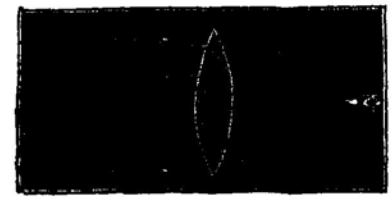
এই আলোকের গতির-দিক পরিবর্ত্তন অনেক প্রকারে পরীক্ষা করিয়া দেখা যাইতে পারে। (১) একটী বড় বাটী লও, প্রদীপের নিকট এমন ভাবে বাটীটি রাখ যেন বাটীর পার্শ্বের ছায়া বাটীর ভিতরে তলায় ঠিক মাঝখানে পড়ে., এখন সেই বাটী জল পূর্ণ কর। দেখিবে পূর্ব্বে যেখানে ছায়া পড়িয়াছিল এখন সেখানে নাই, পার্শ্বের দিকে সরিয়া আসিয়াছে। (২) একটা বড় কাঁসার বা পাথরের বাটীতে একটা পয়সা বা সিকি রাখিয়া দাও। বাটীটি সরাইয়া সম্মুখে এমন স্থানে রাখ যেন পয়সা বা সিকিটী ঠিক বাটির কাঁনার আড়ালে পড়ে। এখন কাহাকেও বাটীতে জল পূরিতে বল। জলে বাটী পূর্ণ হইলে দেখিবে যে, বাটীর তলদেশ অনেক উপরে উঠিয়াছে এবং পয়সা বা সিকি দেখা যাইতেছে। (৩) জলের ভিতর যদি এক গাছা লাঠী ডুবাইয়া ধর দেখিতে পাইবে, বোধ হইতেছে যেন নিমগ্ন অংশটী জলের উপরিভাগ হইতে ভাঙ্গিয়া

গিয়াছে আর ভাঙ্গা দিক্‌টা উপরের দিকে উঠিতে চেষ্টা করিতেছে।

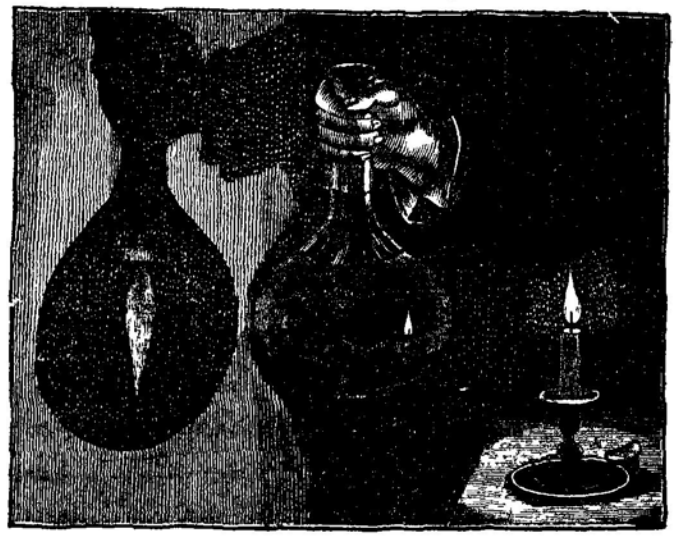
এই বক্রগতির জন্য আমরা অনেক সময়ে ভুল দেখি। পুষ্করিণী ও নদী যতটা গভীর আমরা তদপেক্ষা কম গভীর দেখি। সূর্য্য চন্দ্র নক্ষত্র বাস্তবিক যেখানে থাকে (ঠিক মাথার উপর ছাড়া) ঠিক সেখানে দেখি না। চন্দ্র সূর্য্য বাস্তবিক অস্ত যাওয়ার পরও আমরা অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত দেখিতে পাই। আবার বাস্তবিক উদয় হইবার বহু পূর্ব্বেও আমরা সূর্য্যোদয় দেখি। আমরা যখন জানালা বা দরজার কাচের ভিতর ভিতর দিয়া দেখি তখন বোধ হয় দূরের জিনিষ গুলি ঠিক স্থানেই দেখিতেছি, কিন্তু তাহা নহে। যাহারা চসমা চখে দেয় তাহারা কোন বস্তু স্বস্থানে দেখে না।

তোমাদের একটা বলিয়া দেওয়া আবশ্যক। আলোক রশ্মি অধিকতর ঘন পদার্থ হইতে কম ঘন পদার্থের ভিতরে আসিবার সময়ে যদি বড় বেশী কাত্ হইয়া আসে তবে আর কম ঘন পদার্থে প্রবেশ করিতে পায় না। সেই ঘন পদার্থের শেষ ভাগে আসিয়া আবার বিপরীত দিকে ফিরিয়া যায় অর্থাৎ সেই রশ্মি পরাবর্ত্তিত হয়। এ বিষয় বারান্তরে বলিব।

পয়সার মত গোল এক খণ্ড কাঁচ যদি চেপ্‌টা না হইয়া কচুরীর মত হয় তবে তার ভিতর দিয়া যখন আলো যায় তখন অনেক মজার মজার ঘটনা হয়। এই রকম কাচকে তোমরা বোধ হয় আতসী কাচ বলিয়া থাক। এই কাচ সহজেই পাইতে পার। এইরূপ একখানি কাচ যদি কোথাও খুজিয়া না পাও তবে বুড়োদের (পণ্ডিত মহাশয়ের বা গুরুমহাশয়ের বা ঠাকুরদাদার) চসমা চোখ হইতে লইবে। এই চসমার একটা কাচ যদি সূর্য্যের দিকে ধর, আর তার নীচে একটু দূরে যদি একখণ্ড কাগজ ধর, তবে দেখিবে সেই কাগজে ছোট গোল আলো পড়িয়াছে। কাগজ খানি যদি কাচের নিকট হইতে ক্রমে ধীরে ধীরে দূরে সরাইতে থাক, এমন এক স্থান আসিবে যেখানে গোল আলোটী খুব উজ্জ্বল এক বিন্দুতে পরিণত হইয়াছে। সেই আলোক-বিন্দু যদি কাগজের উপর কিয়ৎকাল ধর তবে কাগজের সেই স্থান পুড়িয়া যাইবে। ঐ বিন্দুতে যদি হাত দাও তবে আগুনের মত গরম লাগিবে। এই রকম কাচে টীকে ধরান যায়।



উপরের চিত্র দেখ, একখানি চারিপাশ সরু মাঝখানটা মোটা একটা কাচ সূর্য্যের কিরণে ধরা হইয়াছে। কাচের উপর যত কিরণ পড়িয়াছে সব বাঁকিয়া গিয়া এক বিন্দুতে জড় হইয়াছে। এই বিন্দুকে অধিশ্রয়ণ বিন্দু বা কিরণ-সমাহার বিন্দু বলে। রাত্রে দেয়ালের নিকট যদি এই কাচ ধর তবে দেয়ালে সম্মুখের প্রদীপের একটী সুন্দর উল্টা ছবি পড়িবে আবার কাচ খানি প্রদীপের খুব কাছে আনিয়া ধীরে ধীরে দূরে সরাইতে থাক দেখিবে সম্মুখের দেয়ালে একটা খুব বড় উল্টা প্রদীপের ছবি পড়িয়াছে। দেখ ওরকম কাচ যদি নিতান্তই না পাও তবে একটা গোল কাচের বোতল লইয়া জলপূর্ণ কর তাহা হইলেও এই সব পরীক্ষা করিতে পারিবে। অপর পৃষ্ঠার চিত্রে দেখ কেমন একটা গোল বোতলে জল পুরিয়া প্রদীপের কাছে



ধরা হইয়াছে আর দেয়ালে কেমন বড় উল্টা ছবি পড়িয়াছে।

কোন ঘরের দরজা জানালা সব বন্ধ করে একটা দরজা বা জানালায় যদি ছোট একটী ছিদ্র করিয়া লও আর সেই ছিদ্রে যদি ঐ রকম একখানি চসমার কাচ কোন রকমে বসাইয়া দাও, আর ঘরের ভিতর কাচের সামনে যদি একখানি কাগজ ধর তবে বাহিরের সমুদয় বস্তুর কেমন যথাযথ ছবি পড়িয়াছে দেখিতে পাইবে। ছবিগুলি কিন্তু উল্টা হইয়া পড়িবে। দিনের বেলায় যদি ঘরের বারান্দায় কিম্বা ঘরের ভিতরেই দরজা বা জানালার নিকট আসিয়া একখানি সাদা কাগজের নিকট যদি বুড়োদের চসমা ধর তবে সম্মুখে দূরের সকল বস্তুরই ছোট উল্টা ছবি কাগজখানির উপর পড়িয়াছে দেখিতে পাইবে।

ঐ রকম একখানি কাঁচ চোখের কাছে যদি ধর আর কাঁচের ওপাশে যদি তোমার বইখানি ধর তবে বই এবং অক্ষরগুলি খুব বড় বড় দেখিতে পাইবে। একটী গোল বোতলে জল পুরিয়া বোতলের ওপাশে যদি হাত দাও তবে এপাশ হইতে হাতের আঙ্গুলগুলি খুব মোটা মোটা দেখিতে পাইবে। এইরূপ কাঁচে অণুবীক্ষণ তৈয়ার হয়। এই কাঁচের সাহায্যে ফোটোগ্রাফও তৈয়ার হয়।

---

## আদর্শ-শিক্ষা।

( ৮৫ পৃষ্ঠার পর। )

ক। ( বেড়াইতে বেড়াইতে ) পণ্ডিত মহাশয়, ঐ প্রকাণ্ড গাছটা কি গাছ?

অ। নিমগাছ।

ক। নিমগাছ অত বড়! কখনই নয়।

অ। দেখ দেখি, ওর নিমপাতার মত পাতা নয় কি?

প। অত বিবাদে কায কি, পড়েই দেখ না, ঐত গাছে টিকিট লাগান আছে।

অ,ক। Swie-Swiete-nia ma-he-goni.

ক। (পড়া সমাপ্ত না হইতেই) পণ্ডিত মহাশয় এই কি মেহগনি গাছ? যার কাঠে সিন্দুক বাক্স প্রভৃতি প্রস্তুত হয়।

প। হাঁ, এই মেহগনি গাছ; অমল যাহা পড়িতেছে মনোযোগ দিয়ে শুন, তার পরে যাহা জিজ্ঞাসা করিবার থাকে তাহা করিও।

অ। Swie tenia mahagoni. Hab, West Indies, Mexico. N. O. Cedrelaceeæ.

ক। পণ্ডিত মহাশয়, Hab. West Indies Mexico. ইহার মানে কি।

প। ওয়েষ্ট ইণ্ডিস এবং মেক্সিকো হইতে আনা হইয়াছে।

অ। তার অর্থ কি? আর কোন স্থানে কি এ গাছ জন্মে না? এই ত এই বাগানে জন্মাইয়াছে।

প। আজকাল যদিও এদেশের অনেক স্থানে মেহগনি গাছ যথেষ্ট দেখিতে পাওয়া যায় কিন্তু অনেক পূর্ব্বে এ গাছ এদেশে পাওয়া যাইত না, প্রথমে মেক্সিকো এবং ওয়েষ্ট ইণ্ডিস প্রভৃতি স্থান হইতে এদেশে আনা হয়।

ক। এ বাগানে আর কোন গাছ আছে কি যাহা মেহগনির মত অন্যদেশে হইতে আনা হইযাছে?

প। আছে বই কি, এরূপ অনেক গাছ আছে, যাহা এদেশে পূর্ব্বে পাওয়া যাইত না।

অ। পণ্ডিত মহাশয় এই গাছটি ম্যাডাগাসকার থেকে এসেছে, এই দেখুন লেখা আছে:— Po-Pain-ci-a-na. Re-ai-a Madagascar.

ক। সে কি! এগাছ ত এখানে যথেষ্ট দেখ্‌তে পাওয়া যায়; কেল্লার ময়দানে রাস্তার ধারে ধারে এই রকমের গাছ কত আছে।

প। তা সত্য, কিন্তু অনেক পূর্ব্বে এদেশে এ গাছ পাওয়া যাইত না, তোমরা আজকাল এই গাছ যত দেখিতে পাও আমরা যখন বালক ছিলাম তখন এত দেখিতে পাইতাম না।

অ। পণ্ডিত মহাশয় ম্যাডাগাসকার হইতে,কেমন ক'রে আনা হল, আর কেই বা আনিল?

প। প্রথমে ছোট ছোট চারা গাছ কিম্বা বীজ আনা হয়,পরে ঐ সকল চারাগাছ এবং বীজ হইতে বড় বড় গাছ হয়, তাহাদের বীজ হইতে আবার চারা এবং গাছ জন্মে; এইরূপে এই জাতীয় গাছের সংখ্যা ক্রমে বৃদ্ধি হইয়াছে। আর এই বটানিকাল গার্ডেন যে কেবল লোকের বেড়াইবার নিমিত্ত হইয়াছে তাহা নয়। এদেশের যে সকল লতা, গুল্ম এবং বৃক্ষ ইত্যাদি জন্মে না অন্য দেশ হইতে তাহা এদেশে আনা, এবং এদেশের গাছ, পালা অন্যান্য দেশে পাঠান এই বাগানের একটি প্রধান কায। এখন তোমরা বোধ হয় বুঝিতে পারিয়াছ এই সকল ভিন্ন দেশীয় গাছ কেমন করিয়া আনা হয় এবং কেইবা আনে।

ক। পণ্ডিত মহাশয় ওকগাছ (Oak) দেখান না।

অ। পণ্ডিত মহাশয় চেরি ফলের গাছ (Cherry) দেখান না।

প। ও সকল যে শীতপ্রধান দেশের গাছ, এখানে জন্মায় না, এবং যত্ন করিয়া রোপণ করিলেও অধিক দিন বাঁচে না।

অ,ক। এই না আপনি বল্লেন যে, এ দেশে যে সকল গাছ পাওয়া যায় না অন্যান্য দেশ হইতে সে সকল গাছ পালা এ দেশে আনান হয় এবং অন্যান্য দেশে এখান হইতে গাছ পালা পাঠান হয়।

প। সে কথা সত্য, আর মেহগনি এবং বড় কৃষ্ণ চূড়ার গাছ Poinciana Regia ঐ কথায় সত্যতাও প্রমাণ করিতেছে, তবে বিদেশীয় সেই সকল গাছ পালা এ দেশে বাঁচে এবং ক্রমে সংখ্যায় বেশী হয় যাহাদের পক্ষে এদেশের জল বায়ু অনুকূল। এমন অনেক বিদেশীয় গাছ আছে যাহা এদেশে বাঁচে না।

অ। পণ্ডিত মহাশয়, কেমন সুন্দর সুপারী গাছ দেখুন।

প। ভাল ক'রে দেখ দেখি?

অ। কেন পণ্ডিত মহাশয়?

ক। কেন পণ্ডিত মহাশয় বলুন না?

প। এ গাছগুলি কি বল দেখি?

অ। সুপারী গাছ।

প। এ গাছগুলি যদি সুপারী গাছ হয় তাহা হইলে যে গাছটিকে সুপারী গাছ বলিয়া আমাকে দেখাইতেছিলে সেটি সুপারী গাছ নয়।

অ,ক। কেন পণ্ডিত মহাশয়, দেখ্‌তে ত একি রকম।

প। এই জন্যেই বলিতেছিলাম ভাল করে দেখ।

ক। এই যে এ গাছের টিকিট আছে পড়ে দেখি

প। সেত বড় সহজ কথা, কিন্তু আমি যা বল্লেম তার কি? পড়ে দেখার আগে এই গাছগুলির সঙ্গে তুলনা করিয়া দেখ দেখি কোন প্রভেদ দেখিতে পাও কি না।

অ,ক। (অনেকক্ষণ দেখার পর) হাঁ পণ্ডিত মহাশয় পাই।

প। কি প্রভেদ বল দেখি।

ক। অমল, যে গাছটিকে সুপারী গাছ বলিয়া দেখাইতেছিল সেটি যদিও ঐ প্রকৃত সুপারী গাছগুলির সমান উচু কিন্তু উহার কাণ্ড অপেক্ষাকৃত মোটা, আর সুপারী গাছের কাণ্ড যেমন কাটা কাটা উহার তাহা নয়, বেশ মসৃণ।

অ। পণ্ডিত মহাশয় আমি বলি।

প। আচ্ছা বল।

অ। আমি যেটীকে সুপারী গাছ বলিয়া দেখাইয়াছিলাম সে গাছের পাতা প্রকৃত সুপারীর পাতার মত নয়। উহার পাতা কতকটা নারিকেলের পাতার মত, তবে অত বড় বড নয়, কিন্তু দেখ্‌তে বড় সুন্দর। যদিও ভাল ক'রে বল্‌তে পার্‌ছিনে কিন্তু প্রভেদ বেশ দেখ্‌তে পাচ্ছি।

প। বড সন্তুষ্ট হ'লেম। তোমরা এতক্ষণ কেবল উপর উপর দেখিযাই আপন আপন মত প্রকাশ করিতেছিলে। চোখে দেখিতেছিলে বটে কিন্তু মনে দেখিতেছিলে না।

অ। পণ্ডিতমহাশয় মনে দেখা কি? চোখ দিয়েই ত দেখ্‌তে পাওয়া যায়, মন দিয়ে ত দেখা যায় না।

প। প্রথমে যখন ঐ গাছটি দেখেছিলে তখন কি চোখ দিয়ে দেখনি?

অ। আজ্ঞা হাঁ পণ্ডিতমহাশয় দেখ্‌ছিলেম।

প। কিন্তু ভাল করে ত দেখ্‌তে পাও নি।

অ। ততটা মনোযোগ দিই নি।

প। মনোযোগ দাও নি বলেইত ভাল ক'রে দেখ্‌তে পাও নি। এখন বুঝিতে পারিলে যে ভাল ক'রে কিছু দেখ্‌তে হ'লে চোখের সঙ্গে মনের যোগ চাই।

অ,ক। পণ্ডিত মহাশয় বেশ বুঝেছি, এরি নাম "মনে দেখা"।

প। আচ্ছা, এখন টিকিটখানা পড়িয়া দেখ।

অ,ক। Se-a-fo-r-thi-a-ch-e-gans. Hab. Tropical Australia. N.O. Palmaceæ.

ক। পণ্ডিত মহাশয়, এ গাছ কি অষ্ট্রেলিয়া দেশের ?

প। দেখ্‌লেত তাই লেখা আছে।

অ। অষ্ট্রেলিয়া দেশেও গাছ পালা আছে।

প। বড় আশ্চর্য্য হ'লে না কি ?

ক। পণ্ডিত মহাশয়, পৃথিবীর সকল স্থানেই কি গাছ পালা আছে ?

প। হাঁ, পৃথিবীর প্রায় সকল স্থানেই গাছ পালা আছে, তবে কোন স্থানে কম কোন স্থানে বেশি। উষ্ণ প্রধান দেশ সকলে গাছ পালা বেশি জন্মে এবং খুব বড় বড় হয়, আর শীতপ্রধান দেশে আপেক্ষাকৃত কিছু কম। শীত প্রধান দেশেও কোন কোন স্থানে খুব বড় গাছ দেখিতে পাওয়া যায়। আর এক কথা, যদিও পৃথিবীর প্রায় সর্ব্ব স্থানেই গাছ পালা পাওয়া যায় কিন্তু কোন দুই দেশের গাছ পালা ঠিক এক রূপ নয়।

অ। পণ্ডিত মহাশয়, আপনি দুই বারই বলিলেন "পৃথিবীর প্রায় সর্ব্ব স্থানেই গাছ পালা পাওয়া যায়" তবে কি এমন কোন স্থান আছে যেখানে গাছপালা পাওয়া যায় না ?

প। যে সকল স্থানে নিয়ত বরফ জমিয়া থাকে সেখানে গাছ পালা জন্মে না, আর মরুভূমিতেও কোন প্রকার উদ্ভিদ্ জন্মে না।

ক। হাঁ পণ্ডিত মহাশয়, আফ্রিকা দেশের সাহারা মরুভূমিতে গাছ পালা নাই।

অ। গ্রীনলণ্ড প্রভৃতি স্থানেও উদ্ভিদাদি জন্মে না।

প। আমি যখন বলিয়াছিলাম "পৃথিবীর প্রায় সর্ব্বস্থানেই গাছ পালা পাওয়া যায়" তখন কি একথা মনে হয় নি।

অ,ক। (কিঞ্চিৎ লজ্জিত হইয়া) মনে হয় নি।

অ। পণ্ডিত মহাশয়, N. O. Palmaceæ, ইহার অর্থ কি ?

প। গাছটী তালজাতীয়, কিন্তু উদ্ভিদ্ বিদ্যা না পড়িলে ভাল করিয়া এবিষয় বুঝিতে পারিবে না। এই দেখ কত প্রকারের গাছ পালা তোমরা দেখিতেছ, কত রকম পাতা, কত রকম ফুল, যেখানে আমরা এখন দাঁড়াইয়া আছি ইহার চতুর্দ্দিকেই কত বিভিন্ন প্রকারের গাছ পালা, কতকগুলি সুপারীর মত, কতকগুলি তাল গাছের মত, আবার কতকগুলি কলাগাছের মত। কোন কোন গাছের পাতা খুব লম্বা লম্বা, আবার ঐ বড় গাছটি দেখ (তেঁতুল জাতীয় গাছ) উহার পাতা কত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র। উদ্ভিদ্ বিদ্যা শিক্ষার সুবিধার জন্য পণ্ডিতেরা এই সকল উদ্ভিদের শ্রেণী বিভাগ করিয়াছেন। সুপারী, নারিকেল, খেজুর, তাল প্রভৃতি গাছ এক জাতীয়, কারণ এই সকল গাছের আকারে অনেক পার্থক্য থাকিলেও স্থূল স্থূল বিষয়ে ইহারা একরূপ। তেঁতুল, বকফুল, শিসুগাছ, সোনা'ল, বাবলা প্রভৃতি এক জাতীয়, কারণ এই সকল গাছের ফুল এক লক্ষণাক্রান্ত।

ক। পণ্ডিত মহাশয়, আমার পাতাগুলি শুকিয়ে উঠেছে।

অ। পণ্ডিত মহাশয়, আমার পাতাগুলিও শুকিয়েছে।

(সখার পাঠক পাঠিকা! ভরসা করি তোমাদের মনে আছে যে, শিক্ষক মহাশয় কতকগুলি

পাতা অমল ও কমলের হাতে দিয়েছিলেন, এ সেই পাতা।)

প। বল দেখি পাতাগুলি কেন শুকাইল।

অ। রৌদ্রে।

ক। রৌদ্রে আর সকল পাতা শুকায় না কেন?

অ। ও সকল পাতা কেন শুকাবে, ও সব যে গাছে লেগে আছে।

ক। কেন আমার হাতে যে পাতাগুলি আছে তার অনেকগুলির ত ছোট ছোট ডাল আছে, তারাও কেন শুকিয়েছে।

প। ডাল থাকিলেই যে শুকাবে না তার কোন অর্থ নাই।

অ। শুকাবার কারণ কি বলুন না।

প। সেই রঙ্গনের চারা কেটে ফেলার কথা মনে আছে?

অ, ক। হাঁ পণ্ডিত মহাশয়, আছে।

প। কি বল দেখি।

অ। স্কুলের ছোট বাগানটিতে কতকগুলি জঙ্গলি গাছ হয়, সেইগুলি পরিষ্কার করিতে করিতে মালি একটী রঙ্গনের চারা কেটে ফেলে। মালির অবশ্য কোন দোষ ছিল না, বর্ষাকালে সুন্দর লাল লাল ফুল হইত বলিয়া রঙ্গনের চারাটি আমাদের বড় প্রিয় ছিল। আমরা তাহাকে বাঁচাইবার জন্য আর এক স্থানে পুতিয়া রাখিয়াছিলাম, কিন্তু দুই তিন দিনের মধ্যেই চারাটি শুকাইয়া যায়।

ক। পণ্ডিত মহাশয়, আপনি ঐ চারা শুকাইবার কারণ বুঝাইয়া দিবার সময় বলিয়াছেন যে, মূল দ্বারা গাছ পালা মৃত্তিকা হইতে রস আকর্ষণ করে, এবং সেই রস দ্বারা উদ্ভিদ সকল জীবিত থাকে এবং বর্দ্ধিত হয়।

প। ভাল। তার সঙ্গে এই পাতা এবং ডালগুলি শুকাইবার কি সম্বন্ধ?

অ। বিলক্ষণ সম্বন্ধ আছে, এই পাতা এবং ডালগুলির পুষ্টির জন্য আহারের আবশ্যক, কিন্তু ইহারা ত এখন আহার পাইতেছে না।

ক। পণ্ডিত মহাশয়, যদি এই ছোট ডালগুলিকে মাটিতে পুতিয়া রাখা যায় তা হইলে কি ইহারা সতেজ থাকে না।

প। রঙ্গন গাছত মাটিতে পুতিয়া রাখিয়াছিলে।

অ। আমার মনে আছে আপনি বলেছিলেন যে, *প্রত্যেক উদ্ভিদের স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র অংশের* স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র কায আছে।

ক। মূলের কাজ মৃত্তিকা হইতে রস আকর্ষণ করা।

প। তবে কেন জিজ্ঞাসা করিতেছিলে যে, এই ছোট ছোট ডালগুলিকে পুতিয়া রাখিলে ইহারা সতেজ থাকে কি না?

ক। (কিঞ্চিত লজ্জিত হইয়া) পণ্ডিত মহাশয় মূল নাই বলিয়া ইহারা রস আকর্ষণ করিতে পারিতেছে না, কাযেই ক্রমে শুকিয়ে যাচ্ছে।



## বড়বানল।

আমরা একবার বাদাবন দিয়া নৌকায় যাইতেছিলাম। মাঝিরা নৌকা বাহিয়া যাইতেছে, আমরা নৌকার ছাদের উপর বসিয়া রহিয়াছি; তখন রাত্রিকাল, ছাদের উপর বসিয়া

আকাশের দিক চাহিয়া রহিয়াছি, আকাশের নীল বক্ষে অসংখ্য তারকা ফুটিয়া রহিয়াছে, রাত্রি অন্ধকার, তারাগুলি অযুত হীরক খণ্ডের ন্যায় জ্বল্ জ্বল্ করিয়া জ্বলিতেছে, আমরা অনন্যমনে তাহাই দেখিতেছি। হঠাৎ রাত্রিকালের সেই নিস্তব্ধ নদীর দিকে দৃষ্টি পড়িল, দেখিলাম আকাশের ন্যায় নদীও জ্বলিতেছে। মাঝিরা দাঁড় ফেলিতেছে, আর তাহাতে নদীর জল আন্দোলিত হইয়া আকাশের অসংখ্য তারকার ন্যায় জ্বলিতেছে। আমাদের একটু কৌতূহল হইল, আমরা একগাছা লাঠি লইয়া রাত্রিকালে সেই স্থির, নিস্তব্ধ নদীর বক্ষস্থল আলোড়িত করিতে লাগিলাম, এবং সেই অতি সুন্দর দৃশ্য দেখিতে লাগিলাম। তখন আমাদের বয়স অল্প. জলে আগুন জ্বলিতেছে দেখিয়া একটু আনন্দিত এবং তার সঙ্গে একটু আশ্চর্য্যও হইলাম, কিন্তু ব্যাপারটা কি তাহা তখন বুঝিতে পারি নাই। জল লইয়া খানিকক্ষণ খেলা করিয়া বালকের কৌতূহল নিবৃত্ত হইল। তারপর অনেক দিন পরে কতক বুঝিয়াছি, জলে এ আগুন কেন জ্বলে যাহা বুঝিয়াছি তাহা বলি।

আমাদের দেশে এ আগুনকে বাড়বাগ্নি বা বাড়বানল বলিয়া থাকে। মহাভারতে ইহার উৎপত্তির যে গল্প আছে তাহা তোমরা অবশ্য পড়িয়া থাকিবে, গল্পটা সংক্ষেপে বলি। কৃতবীর্য্যের বংশের রাজারা একসময় ভৃগু-বংশের রাজাদের কাছে কোন কার্য্য বশতঃ কিছু অর্থ প্রার্থনা করেন, ভৃগু বংশের রাজারা সে প্রার্থনা পূর্ণ না করায়, কৃতবীর্য্যের বংশীয় রাজারা অপমানিত হইয়া ভৃগু-বংশীয়দিগকে নিহত করেন; কিন্তু তাঁহাদের বংশের মহিলাগণ হিমালয় পর্ব্বতে পলায়ন করিয়া রক্ষা পান। এই স্থানে ইহাঁদের ঔর্ব্ব নামে এক পুত্র জন্মে। ঔর্ব্ব কৃতবীর্য্যের বংশধরদের অত্যাচার এবং নিজ পিতৃকুলের বিনাশের সংবাদ অবগত হইয়া, সৃষ্টি ধ্বংশের জন্য কঠোর তপস্যা আরম্ভ করেন। কিন্তু পিতৃলোক এই কার্য্য হইতে বিরত হইতে বলাতে, ঔর্ব্ব তাঁহাদের আজ্ঞানুসারে, তাঁহার ক্রোধরূপ যে অগ্নি তাহা সমুদ্রে নিক্ষেপ করেন। ইহাতে হঠাৎ একটা ভয়ানক অশ্বের মস্তক উৎপন্ন হয়, এবং সেই অশ্বের মুখ হইতে ঔর্ব্বের ক্রোধ অগ্নি নিগত হইতেথাকে। এই জন্য ইহাকে বাড়বানল বা বাড়বাগ্নি বলা হয়। বাড়বা অর্থে ঘোটকী। এই ত গেল পুরাণের কল্পনা।

বৈজ্ঞানিকদের মধ্যে ইহার কারণ সম্বন্ধে অনেক মত আছে, সে সকল মতামত উল্লেখের প্রয়োজন নাই। কেহ বলেন সমুদ্র জলে ফস্‌ফরস্ নামক রাসায়নিক পদার্থ আছে, তাহাতে বায়ুর যোগ হইলেই জ্বলিয়া উঠে, কেহ বা বলেন যে, বিভিন্ন প্রকৃতির তাড়িৎবিশিষ্ট মেঘে মেঘে ঘর্ষণে যেমন বিদ্যুতের উৎপত্তি হয়; ইহাতেও তেমনি বিভিন্ন প্রকৃতির তাড়িৎবিশিষ্ট সমুদ্র তরঙ্গে তরঙ্গে ঘাত প্রতিঘাতে এই উজ্জ্বল আলোকের সৃষ্টি হয়। এই প্রকার আরও অনেক মত আছে, কিন্তু বর্ত্তমানকালের বৈজ্ঞানিকেরা ইহার অন্য আর এক কারণ স্থির করিয়াছেন। ইহাঁরা বলেন এক প্রকার সামুদ্রিক কীটই এই বাড়বানলের মূল। একজন ইহাও পরীক্ষা দ্বারা স্থির করিয়াছেন যে, সমুদ্রে যে সকল প্রাণী বাস করে তাহাদের শরীর পচিলে তাহা হইতে বাড়বানলের উৎপত্তি হইয়া থাকে। জীবন্ত প্রাণীর দেহ হইতে যে এই আলোক উৎপন্ন হয়, তাহার একটী বিবরণ নিম্নে সংগৃহীত হইল। ডাক্তার বুকানন জাহাজে চড়িয়া ভারত মহাসাগরের উত্তর ভাগ দিয়া যাইতেছিলেন, একদিন দেখিলেন, সন্ধ্যার পর হইতেই সমুদ্রজল ক্রমে সাদা হইয়া উঠিতেছে, রাত্রি আটটার পর

দেখিলেন যে, আকাশে ছায়াপথ যেমন উজ্জ্বল, সমুদ্র জলও তেমনি উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে, ছায়াপথে যেমন অগণ্য উজ্জ্বল তারকা দেখা যায়, সমুদ্র জলেও তেমনি অসংখ্য উজ্জ্বল তারকা জ্বলিতেছে। রাত্রি দুই প্রহরের পর এই উজ্জ্বলতা ক্রমে ক্ষীণ হইতে লাগিল, প্রাতঃকালে আর উজ্জ্বলতা একেবারেই দেখা গেল না। ডাক্তার বুকানন বিস্মিত হইয়া সেই স্থানের খানিকটা সমুদ্র জল তুলিয়া লইলেন এবং সেই জল পরীক্ষা করিয়া দেখিলেন যে, তাহাতে অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দীপ্তিশীল কীটাণু রহিয়াছে। এই কীটাণুগুলির শরীর হইতে এই আলোক নির্গত হইতেছে।

আর একজন সাহেব পরীক্ষা দ্বারা দেখিয়াছেন যে, এক প্রকার মৎস্য হইতে এই আলোক নির্গত হয়। এই মৎস্যের আকার গোল, ইহারা ইহাদিগের পক্ষ কম্পিত করিলেই তাহা হইতে আলোক নির্গত হইতে থাকে। এ ছাড়া আরও কয়েক-প্রকার মৎস্য হইতে আলোক নির্গত হয়, তাহাও পরীক্ষা দ্বারা স্থির হইয়াছে। ইহাদের বর্ণ ইস্পাতের মত, শরীরের নীচের দিকে ছোট ছোট গর্ত্ত আছে, ইহারা যখন সন্তরণ করে, তখন এই গর্ত্ত হইতে উজ্জ্বল আলোক নির্গত হইতে থাকে। যখন ইহারা অধিক উত্তেজিত হয়, তখন গর্ত্ত হইতে আলোক নির্গত না হইয়া মস্তক শরীর হইতে উজ্জ্বল অগ্নিশিখা নির্গত হইতে থাকে। বাড়বানল সকল সময় সমান উজ্জ্বল দৃষ্ট হয় না। ইহা কখনও বা ক্ষীণ আলোকের ন্যায়, কখনও বা অতিশয় উজ্জ্বল, কখনও বিদ্যুতের ন্যায় চঞ্চল, কখনও স্থির দৃষ্ট হয়। সমুদ্রেই ইহা বিশেষভাবে দেখা যায়, যদি ইচ্ছা হয় পাঠক পাঠিকাগণ চক্ষে দেখিয়া কৌতূহল নিবৃত্ত করিতে পারেন।

---

# মামথ।



মামথ সম্বন্ধে লিখিতে গিয়া সেবারে মামথ সম্বন্ধে আমরা কোন কথাই বলি নাই। কেবল এই মাত্র বলিয়াছিলাম যে, পৃথিবী সৃষ্টির তৃতীয় যুগে মামথের সৃষ্টি হয়। এখন আর মামথ পৃথিবীতে নাই, পৃথিবীর এখনকার অবস্থা মামথের জীবন ধারণের উপযোগী নয়, এইজন্য মামথ এখন পৃথিবী হইতে লোপ পাইয়াছে। মামথের স্থান এক্ষণে হস্তিদ্বারা কতক পূরণ হইয়াছে।

১৭৯৯ খৃষ্টাব্দে প্রথম মামথের অস্তিত্ব জানিতে পারা যায়। লেনা নদীর তীরে একদিন একজন ধীবর মামথদন্তের অন্বেষণ করিতে করিতে, কতক দূর গিয়া একটী দৃশ্য দেখিয়া বিস্মিত ও চমৎকৃত হইল। সে দেখিল বরফরাশির মধ্যে একটা অতি প্রকাণ্ড জীব আবদ্ধ হইয়া রহিয়াছে। প্রথমতঃ সে ভয়ে তাহার নিকটেও গেল না; কিন্তু কয়েক বৎসর গত হইলে পর একদিন সে সাহস করিয়া এই প্রকাণ্ড জীবের দিকে অগ্রসর হইল। নিকটস্থ হইয়া দেখিল যে, সে যে তাহাকে গ্রাস করিয়া ফেলিবে এমন কোন ভাবই প্রকাশ করিতেছে না। তখন তাহার সাহস একটু বাড়িল: তখন আরও অগ্রসর হইল, দেখিল যাহার নিকট সে এতদিন ভয়ে অগ্রসর হয় নাই সে জীবিত নহে, মৃত। তখন মহানন্দে এই প্রকাণ্ড জীবের প্রকাণ্ড দন্ত দুইটী সংগ্রহ করিয়া গৃহে ফিরিয়া গেল; শরীরের অবশিষ্টাংশ শৃগাল শকুনী প্রভৃতির অনুগ্রহে অচিরেই অদৃশ্য হইয়া গেল। দুইবৎসর পরে একজন বৈজ্ঞানিক সেখানে গিয়া উপস্থিত হইলেন; তাঁহার

এই বিলম্বটুকু হইয়াছিল বলিয়া, তাঁহার অদৃষ্টে কেবলমাত্র ইহার অস্থিপঞ্জরই ছিল।

১৮৪৬ খৃষ্টাব্দে একজন রুসীয় কর্ম্মচারী উত্তর সাইবেরিয়াতে জরিপ করিতে গিয়া একটী প্রকাণ্ড মামথ প্রাপ্ত হন। মামথটী যে অবস্থায় পাওয়া-গিয়াছিল তাহাতে তিনি অনুমান করেন যে, মামথটী কর্দ্দমময় জলাস্থানে বিচরণ করিতে করিতে, হঠাৎ সেই কর্দ্দমে তাহার পা বসিয়া যায়। সেই কর্দ্দম হইতে উঠিবার জন্য যত চেষ্টা করিয়াছে, ততই কর্দ্দমে আবদ্ধ হইয়া পড়িয়াছে, এবং সেই অবস্থায়ই তাহার জীবন লীলা শেষ হইয়াছে। ক্রমে তাহার মৃতদেহের উপরে মৃত্তিকা প্রভৃতি স্তরে স্তরে জমিয়া গিয়াছে। এইরূপে কত সহস্র বৎসরের মৃত্তিকা এবং অন্যান্য পদার্থ শরীরের উপর জমিয়া গিয়াছিল কে বলিতে পারে? যেস্থানে এই প্রকাণ্ড জীবটী মৃত্তিকা মধ্যে দৃষ্ট হইয়াছিল, একটা বন্যায় সেইস্থান ভগ্ন হইয়া যাওয়াতে, ইহার প্রকাণ্ড দেহ বাহির হইয়া পড়িল। রুসীয়-কর্ম্মচারী এই সময় সেইস্থানে উপস্থিত হন এবং ইহাকে প্রাপ্ত হইয়া অনেক কষ্টে সংগ্রহ করেন। ইহার সে সময় দেহে কেবল জীবন ছিল না, নতুবা আর সমস্তই অটুট ছিল, কিছুই নষ্ট হয় নাই।

মামথ হস্তির ন্যায় অনেকটা দেখিতে; কিন্তু হস্তি যেমন কদাকার, মামথ তেমন কদাকার নহে; আরবদেশীয় ঘোড়া যেমন ঘোড়ার মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা সুশ্রী, মামথও তেমনি হস্তিজাতীর মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা সুশ্রী। হস্তিঅপেক্ষা মামথ অনেক বড়। যে মামথটীর কথা উল্লিখিত হইল, তাহার উচ্চতা তের ফিট্, পোনের ফিট লম্বা, দন্তগুলি আট ফিট লম্বা, ছয় ফিট লম্বা শুণ্ড, এবং দেড় ফিট চওড়া অতি বৃহৎ চারিখানি পা। ইহাদের সর্ব্বশরীর ঘন সুন্দর কেশে আবৃত।

# উদ্ভিদের আহার।

যদি খাওয়ার দরকার না থাকিত, তবে পৃথিবীর এত উন্নতি হইত না। পেটের জ্বালা আছে বলিয়াই মানুষ এত খাটে, এত পরিশ্রম করে। না থাকিলে এত শিল্প, এত বিজ্ঞান, এত উন্নতি আমরা দেখিতাম না, মানবজাতি নিশ্চিন্ত মনে চক্ষু মুদ্রিত করিয়া নিদ্রা ও আলস্যতায় দিন যাপন করিত। কিন্তু সৃষ্টিকর্ত্তা এমনি একটী ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছেন যে, চক্ষু মুদ্রিত করিয়া নিদ্রায় দিন কাটাইলে মানুষের চলেনা, নিশ্চিন্ত মনে অলসতায় গা ঢালিয়া দিয়া মানুষের থাকিবার উপায় নাই। খাইতে হইবেই, না খাইলে জীবনরক্ষা হইবেই না।

যেমন আমরা জীবনরক্ষার জন্য আহার করি, সৃষ্টির যাবতীয় পদার্থই তেমনি কিছু না কিছু আহার করে; না খাইলে কাহারও রক্ষা নাই। আজ উদ্ভিদের আহারের সম্বন্ধে দু একটী কথা বলিব। সচরাচর উদ্ভিদেরা কি খায়, তাহা আজ বলিব না; উদ্ভিদের আহার সম্বন্ধে যে দু একটী আশ্চর্য্য ঘটনা দেখা গিয়াছে তাহাই বলিব।

সচরাচর উদ্ভিদেরা নিরামিষাশী; সূর্য্যের আলোক এবং মৃত্তিকার রসই ইহাদিগের প্রধান খাদ্য। কিন্তু মানুষের মধ্যে যেমন নিরামিষাশী ও মাংসাশী দুই আছে; কতক লোকের নিরামিষ আহারে তৃপ্তি হয়, অপর কতক লোকের মৎস্য মাংস না হইলে তৃপ্তি হয় না। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, উদ্ভিদদিগের মধ্যেও এই দুই শ্রেণীর উদ্ভিদ

দেখিতে পাওয়া যায়। কতকগুলি উদ্ভিদ্ নিরামিষ আহারেই তৃপ্ত থাকে, সূর্য্যের আলোক প্রভৃতি ব্যতীত তাহারা আর কিছু খায় না। কিন্তু কতকগুলি উদ্ভিদ আছে যাহাদের মৎস্য মাংস না হইলে তৃপ্তি হয় না। কিন্তু এই শ্রেণীর উদ্ভিদের সংখ্যা অতি অল্প। কয়েকটী আশ্চর্য্য ঘটনা নিম্নে সংগৃহীত হইল।

Sun-dew অর্থাৎ "সূর্য্য-শিশির" নামক এক প্রকার ফুলের গাছ আছে, ইহাদিগের এমনি আশ্চর্য্য প্রকৃতি, ইহারা কীট পতঙ্গ আহার করিয়া অনায়াসে জীর্ণ করে। ইহার পাতা আদইঞ্চি পরিমাণ এবং গোলাকার। পাতাগুলির উপরে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অসংখ্য ঘোর লাল রংএর কেশের মত আছে। প্রত্যেক কেশের মাথায় একটী অতি ক্ষুদ্র থলির মত দেখা যায়, এই থলির মধ্যে একটু রস থাকে। গ্রীষ্মকালে সূর্য্য তেজ যত অধিক হয়, এই থলিগুলি ততই রসে পূর্ণ হইতে থাকে। যদি কোন ক্ষুদ্র কীট বা মাছি এই পাতার উপর আসিয়া বসে, তবে আর রক্ষা থাকে না। বেচারি যত পলাইতে চেষ্টা করে, থলির মধ্যের রস ততই তাহার গায়ে লাগিতে থাকে, এবং সেই অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কেশ জালে সে একেবারে আবদ্ধ হইয়া পড়ে। অল্পকাল পরেই দেখা যায় যে, ইহাদিগের শরীরের সারাংশ অদৃশ্য হইয়াছে, "সূর্য্য-শিশির" এই কীট বা পতঙ্গগুলিকে জীর্ণ করিয়া ফেলিয়াছে। পণ্ডিতেরা পরীক্ষাদ্বারা জানিয়াছেন, কীট পতঙ্গই "সূর্য্য-শিশিরের" প্রধান আহার।

আর একজাতীয় ফুলের গাছ আছে, তাহাদিগকে Fly catch অর্থাৎ "মাছি-ধরা" বলে। আফিংখোরেরা ঝিমাইতে ঝিমাইতে যে মাছি ধরে এ তাহা নহে। ইহারা সত্য সত্যই মাছি ধরিয়া খায়। ইহাদিগের প্রত্যেক পাতার উভয়দিকে শুয়াপোকার কাঁটার মত কাঁটা দেখিতে পাওয়া যায়। পাতার উপরের দিকে একপ্রকার মিষ্ট রস জন্মে, মাছিগুলি এই রসের লোভে পাতার উপর বসিবা মাত্র, পাতাটী মুদিত হইয়া যায়। এবং যে পর্য্যন্ত ভিতরে আবদ্ধ কীট জীর্ণ না হয়, ততক্ষণ আর উহা পুনরায় প্রস্ফুটিত হয় না।

Venus' fly-trap, "ভিনসের মাছি-ধরা" নামক একজাতীয় ফুলের গাছ আছে, এই গাছের পাতাগুলির অগ্রভাগ দুই ভাগে বিভক্ত হইয়া দুইটী ক্ষুদ্র পাতার ন্যায় হয়। এই দুইটী ক্ষুদ্র পাতার উপর কতকটা লম্বা কাঁটা থাকে, কোন কীট বা পতঙ্গ ঐ কাঁটা যুক্ত ক্ষুদ্র পাতা দুইটীর কোনটীর উপর বসিলে, তৎক্ষণাৎ পাতা দুইটী বুজিয়া যায়। মধ্যে আবদ্ধ কীটের কি দশা তখন হয়—সহজেই বুঝিতে পার।

এইত গেল কীট পতঙ্গ ভক্ষক উদ্ভিদের কথা। মৎস্য, মৎস্যের ডিম্ব ভক্ষক উদ্ভিদের কথা এখন বলি। এই জাতীয় উদ্ভিদ ইউরোপ ও আমেরিকায় অনেক স্থানে দেখিতে পাওয়া যায়, ইহারা পুকুরে উৎপন্ন হয়। এই বৃক্ষের অর্দ্ধেক জলের উপরে এবং অর্দ্ধেক জলের মধ্যে থাকে। জলের উপরে যে ভাগ থাকে, তাহার মাথায় পেয়ারার ন্যায় আকারের একটা জিনিষ দেখিতে পাওয়া যায়, ইহা জলে পূর্ণ। ইহার যে দিকটা সরু, সেই দিকে একটা মুখ আছে; এই মুখের চারিদিকে শুয়াপোকার কাঁটার মত কাঁটা আছে, ইহার মুখের পশ্চাদ্‌ভাগে একটী স্বচ্ছ কপাট আছে, বাহির হইতে অল্প ঠেলিলেই তাহা খুলিয়া যায়, কিন্তু ভিতর হইতে কোনমতেই খোলে না। এই কপাট খুব পাতলা এবং স্বচ্ছ, এইজন্য ভিতরে জল থাকাতে অতি উজ্জ্বল দেখায়। এই উজ্জ্বলতায় কীট, পতঙ্গ, মৎস্য প্রভৃতি আকৃষ্ট হইয়া ভিতরে প্রবেশ করে। অন্যান্য মাংসাশী এক প্রকার রসের দ্বারা কীট-পতঙ্গগুলিকে জীর্ণ করিয়া

থাকে; কিন্তু ইহারা তাহা করে না। ভিতরে যে জীব প্রবেশ করে সে গুলি না পচিলে ইহারা তাহা জীর্ণ করিতে পারে না। জীবগুলি ভিতরে প্রবেশ করিয়া আর বাহির হইতে পারে না, সুতরাং মরিয়া যায়। তার পর যখন পচে তখন ইহারা সেগুলিকে জীর্ণ করিয়া নিজ শরীর পরিপুষ্ট করে।

তার পর মাংসাশী উদ্ভিদের একটা দৃষ্টান্ত দিয়া কথা শেষ করিব। এ গল্পটা তোমরা অনেকে শুনিয়া থাকিবে। কিন্তু প্রবন্ধ অসম্পূর্ণ থাকিয়া যায় বলিয়া পুরাতন কথাটাও বলিতে হইল। একজন ইউরোপীয় ভ্রমণকারী আফ্রিকা ভ্রমণ কালে এই ঘটনাটী প্রকাশ করিয়াছেন।

একদিন ইনি একটী কাফ্রী বালক ভৃত্যের সহিত মৃগয়ায় গিয়াছেন, এমন সময় একটী হরিণ দেখিতে পাইলেন। হরিণটা তাঁহাদিগকে দেখিবা-মাত্র একটা প্রকাণ্ড বৃক্ষের দিকে দৌড়িল, কিছু কাল পরে হরিণটাকে আর দেখিতে পাওয়া গেল না। সেই কাফ্রী বালকও হরিণের পশ্চাতে দৌড়িয়াছিল, বালক বৃক্ষের নিকট যাইবামাত্র বৃক্ষটা তাহার শাখাগুলি প্রসারিত করিয়া তাহাকে গ্রাস করিয়া ফেলিল। বালক বৃক্ষশাখার মধ্যে আবদ্ধ হইয়া চীৎকার করিতে লাগিল। সাহেব ভৃত্যের চীৎকার শুনিয়া বৃক্ষের দিকে অগ্রসর হইলেন। বৃক্ষের নিকটে গিয়া দেখেন যে ইহার সমস্ত দেহ কাঁপিতেছে, খুব ঝড়ের সময় যেমন গাছের ডাল পালা সঞ্চালিত হয়, তিনি নিকটে গেলে ইহার শাখাগুলিও তেমনি আন্দোলিত হইতে লাগিল, যেন তাঁহাকে গ্রাস করিবার জন্য হস্ত প্রসারণ করিতেছে। বাস্তবিকই তাঁহাকে গ্রাস করিবার জন্য ইহার শাখা প্রশাখা সঞ্চালিত হইতেছিল। সাহেব উদ্ভিদের এই প্রকার ভয়ঙ্কর মাংস-স্পৃহা দেখিয়া চমকিত হইলেন। আমরা হইলে হয়ত ভয়ে অজ্ঞান হইয়া পড়িতাম। কিন্তু সাহেব দূর হইতে ক্রমাগত বৃক্ষের উপর গুলি করিতে লাগিলেন। ক্রমাগত গুলি করিতে করিতে ইহার শাখাগুলি ভাঙ্গিয়া পড়িতে লাগিল। এবং এক প্রকার অতি দুর্গন্ধ রসে চারিদিক দুর্গন্ধময় হইয়া উঠিল। বৃক্ষটা গুলির আঘাতে ক্রমে শাখা-শূন্য হইলে সাহেব একখানা কুঠার লইয়া বৃক্ষটাকে ভূমিসাৎ করিলেন। পরে সেই বৃক্ষের ডালপালার ভিতর সেই হরিণটা এবং সেই কাফ্রী বালকের মৃতদেহ দেখিতে পাইলেন, বৃক্ষের পাতা বালকের শরীরে এমন ভাবে সংলগ্ন হইয়াছে যে, তাহা আর কিছুতেই উঠাইতে পারিলেন না; সেই ভাবেই তাহাকে গোর দেওয়া হইল। সৃষ্টির মধ্যে এই প্রকার কত আশ্চর্য্য ব্যাপার আছে কে বলিতে পারে?



## "স্বভাব যায় না ম'লে
আর
## ময়লা যায় না ধুলে।"

কথিত আছে বিখ্যাত কবি দান্তের একটী বিড়াল ছিল। বিড়ালটি সর্ব্বদা তাঁহার সঙ্গে থাকিত, আহার এবং শয়ন করিবার সময় ও নিকটেই থাকিত কিন্তু তাহা ভিন্ন কবি রাত্রে যত-ক্ষণ বসিয়া লেখা পড়া করিতেন বিড়ালটি ততক্ষণ

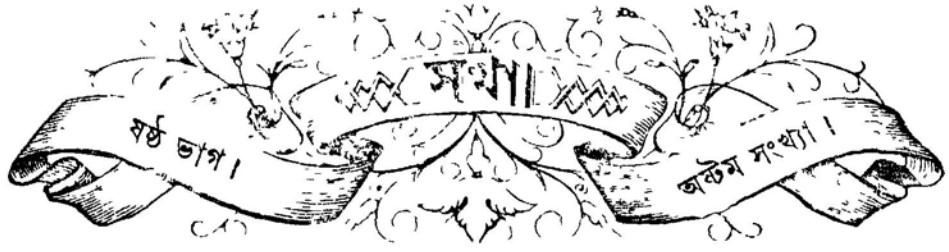
তাঁহার নিকটে বসিয়া থাকিত। কেবল যে বসিয়া থাকিত তাহা নয়, অধিকাংশ সময় আপন থাবায় (paw) বাতি ধরিয়া থাকিত, আর কবি নিশ্চিন্ত মনে সেই বাতির আলোতে পড়িতেন কিম্বা লিখিতেন। কবিই বিড়ালকে বাতি ধরা শিখাইয়াছিলেন এবং তাঁহার শিক্ষার এত ভাল ফল হইয়াছে দেখিয়া বসিয়া বসিয়া লেখা পড়া করিতেন এবং মনে মনে ভাবিতেন "কি শিক্ষাই দিয়াছি।" এক দিন কোন বন্ধু তাঁহার সহিত সাক্ষাত করিতে আসিলে তাঁহার নিকট বিড়ালের গুণ বর্ণনা করিতে করিতে বলিলেন যে, এস্থলে সুশিক্ষা পশু-স্বভাবের উপর জয় লাভ করিয়াছে। বন্ধু শুনিলেন বটে কিন্তু তাঁহার বিশ্বাস হইল না, বন্ধুর বিশ্বাস হইল না দেখিয়া কবি বলিলেন আপনার ইচ্ছা হয়ত পরীক্ষা করিয়া দেখিতে পারেন। অবশেষে তাহাই স্থির হইল। পরীক্ষার দিন উপস্থিত। বন্ধু আসিয়া দেখিলেন কবি গভীর মনোযোগের সহিত কি পাঠ করিতেছেন আর নিকটে তাঁহার প্রিয় শিষ্য বিড়াল, বাতি ধরিয়া বসিয়া আছে। কবির ভাব গম্ভীর, এদিকে বিড়ালের পক্ষে যতটা স্থির এবং গম্ভীর হওয়া সম্ভব সেও ততটা গাম্ভীর্য্যের সহিত প্রভুর কার্য্য সম্পন্ন করিতে রত। আগন্তুক টেবিলের উপর একটী চাদানি (tea-pot) রাখিয়া নিজে একখানি চেয়ারে বসিলেন। এক মিনিট যেতে না যেতে বিড়াল কিছু চঞ্চল হইল, মুহূর্ত্ত পরেই চঞ্চলতা আরও বৃদ্ধি হইল। আগন্তুক বিড়ালের ভাব লক্ষ্য করিতেছিলেন। তিনি তাহার চঞ্চলতা দেখিবা মাত্র চাদানির আবরণ খুলিয়া দিলেন, খুলিয়া দিবা মাত্র তিন চারিটী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ইন্দুর তাহার মধ্য হইতে লাফিয়ে প'ড়ে প্রাণ ভয়ে পলায়ন করিল। বিড়াল আগেই ইন্দুরের গন্ধ পেয়েছিল, এখন দেখিল; তাহার মনে মহা সংগ্রাম উপস্থিত, একদিকে কর্ত্তব্য আর একদিকে প্রলোভন। কিন্তু এ সংগ্রাম কেবল মুহূর্ত্তের জন্য, কর্ত্তব্যজ্ঞান তাহার মাথায় উঠিল, কোথায় গেল বাতি, কোথায় গেল কবির কাগজ পত্র সে ইঁদুরের পশ্চাতে ছুটিল, কিন্তু ইঁদুরের কোনটিকে ধরিতে পারিয়াছিল কি না বলিতে পারি না। কবি মহা অপ্রস্তুত হইলেন এবং তাঁহার বন্ধু উল্লাসে হাত তালি দিয়া বলিতে লাগিলেন "স্বভাব যায় না মলে আর ময়লা যায় না ধুলে"।

---

## বিড়ালের স্মরণ শক্তি।

আয়র্লণ্ড দেশে কোন মহিলার একটী বিড়াল ছিল, বিড়ালটি সর্ব্বদাই তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে থাকিত। ঐ মহিলার সমস্ত টাকা কড়ি উইল করিয়া তাঁহার এক আত্মীয়কে লিখিয়া দিয়াছিলেন। ঐ মহিলার মৃত্যুর পর তাঁহার অন্যায় যখন টাকার সিন্দুক খুলতে যান তখন ঐ বিড়ালটি লাফিয়ে উঠিয়া এমন ক'রে তাহার গলা কামড়াইয়া ধরে যে, তখন তাঁহার প্রাণ যায় যায় হইয়াছিল এমন কি লোকে ছাড়াইয়া না দিলে তিনি তখনি মারা পড়িতেন। এই ঘটনার কয়েক বৎসর পর ঐ লোকটির মৃত্যু হয়। মৃত্যু শয্যায় তিনি স্বীকার করিয়া গিয়াছিলেন যে, তিনিই তাঁহার আত্মীয়াকে হত্যা করেন এবং ঐ বিড়াল সেই হত্যাকাণ্ড দেখিয়াছিল।






আগষ্ট, ১৮৮৮।

# কাগজের খেলনা।

ঠিক পাঠিকাগণ। তোমরা বিলাত হইতে আনীত কাগজের নাসদানী, চশমার খোল বা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খেলনা দেখিয়া হয়ত মনে কর যে ছেঁড়া কাগজ জমাইয়া তাহা দ্বারা ইংরেজেরা যেমন নানা প্রকার দ্রব্য তৈয়ার করেন, এমন বাহাদুরী বুঝি আমাদের দেশের লোকেরা করিতে পারে না। এরূপ মনে করা কিন্তু বড়ই ভুল। আমাদের দেশে কাগজ হইতে যেরূপ উৎকৃষ্ট ও চমৎকার জিনিস তৈয়ার হইতে দেখা যায়, তাহার নিকট অপর সকল দেশের জিনিস বোধ হয় দাঁড়াইতে পারে না। তোমরা অনেকে খুব ভাল কাশ্মিরী শাল বা জামিয়ার দেখিয়াছ। সেই শাল বা জামিয়ারের পাড়, জমি, অথবা প্রত্যেক কোণে নানা বর্ণের পশমী সূতার কত প্রকার কারিকুরিও দেখিয়াছ। উৎকৃষ্ট শাল প্রভৃতির উপর এই যে সকল কারুকার্য্যের কথা বলা হইল, ঠিক তদ্রূপ সুন্দর কাজ করা কত প্রকার ব্যবহার্য্য জিনিস কাশ্মীরে কাগজ হইতে প্রস্তুত হইয়া থাকে। দুঃখের বিষয়, এ দেশের বড় লোকেরা ঘর সাজাইবার জন্য সে সকল জিনিস ভ্রমেও কিনিতে চাহেন না। কিন্তু বিদেশীয়েরা ইহা আদরের সহিত গ্রহণ করিয়া থাকেন। আবার একটি মজা দেখ, কাশ্মীরের এই সুন্দর জিনিসের কথা কোন দেশীয় যুবককে জিজ্ঞাসা কর, তিনি তোমার কথা শুনিয়া চিত্রপুত্তলির ন্যায় তোমার দিকে চাহিয়া থাকিবেন। কাগজ হইতে আবার আমাদের দেশে যে চমৎকার শিল্প-দ্রব্য তৈয়ার হইয়া থাকে, ইহা তাঁহার জ্ঞানে বোধ হয় কখন শুনেন নাই, অথবা শুনিলেও বোধ করি সহজে তিনি বিশ্বাস করিতে চাহেন না। কিন্তু একজন বড় ইংরেজ, যিনি দুই চারি বৎসর মাত্র ভারতবর্ষে কর্ম্মোপলক্ষে আসিয়া বাস করিতেছেন তাঁহাকে এ জিনিসের কথা জিজ্ঞাসা করিলে হয়ত তৎক্ষণাৎ তিনি ইহার কিছু ইতিহাস তোমাকে বলিতে পারিবেন, অথবা তাঁহার ঘরে ঐরূপ দুই একটি জিনিস থাকিলে তোমাকে দেখাইয়া দিবেন।

কাশ্মীরের কারিকরেরা এদেশের বড় লোকের নিকট হইতে আদৌ উৎসাহ পায় না বলিয়া তাহারা যে সকল দ্রব্য প্রস্তুত করে তাহার মধ্যে সাহেবী পছন্দ জিনিসের সংখ্যাই অধিক দেখা যায়। তথায় ফুলদান, রেকাব, বাটী, টিকিটদান, চুরুটের বাক্স, কলমদান বাক্স, বিস্কুটের বাক্স বা চা খাইবার বাসন প্রভৃতি নানা প্রকার দ্রব্য কাগজ জমাইয়া তৈয়ারি হইয়া থাকে। জিনিস-

গুলি তৈয়ারি হইয়া যখন বেশ শুষ্ক হয় তখন কারিকরেরা তাহাদের উপর কোন একটি জলীয় রং মাখাইয়া প্রথমে "জমি" প্রস্তুত করে। তাহার পর ঐ জমির উপর অপরাপর নানা বর্ণের রঙ্গে তুলি দ্বারা ঠিক শালের নমুনায় বল্লা, ফুল, পাতা প্রভৃতি সুন্দর ভাবে চিত্র করিয়া জিনিসগুলিকে সাজান হয় ও অবশেষে বার্ণিস মাখাইয়া ঐ সমস্ত রংকে ঢাকিয়া স্থায়ী করা হয়। এক টাকা হইতে পঞ্চাশ ষাইট টাকা পর্য্যন্ত এক একটি জিনিস তৈয়ার হইয়া থাকে।। ইহার শোভা ও কারু-কার্য্য দেখিলে বাস্তবিকই মনে বড় সুখ হয়।

কাশ্মীরের দেখা দেখি পঞ্জাবের মধ্যে অমৃতসর ও উত্তর-পশ্চিম প্রদেশের মধ্যে বিজনৌর ও জৌনপুরেও এইরূপ অনেক জিনিস তৈয়ারি হইয়া থাকে। অমৃতসরের দ্রব্যগুলি অনেকটা কাশ্মীরের নমুনাতেই তৈয়ারি হয়, কিন্তু তত ভাল হয় না। উত্তর-পশ্চিমের দ্রব্যগুলির কারু কার্য্য কাশ্মীরের কারু কার্য্য হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন। কখন শুদ্ধ ঘোর সবুজ বর্ণের জমির উপর সোনালী ফুল কাটা, কখনও বা অপর পাঁচ রঙ্গের নানা প্রকার যে সকল চিত্র কার্য্য দেখা যায় সেগুলি কাশ্মীরের শালের নমুনার মত তত সুন্দর ও সূক্ষ্ম নয়, এজন্য জিনিসগুলির মূল্যও অপেক্ষাকৃত কম। জৌনপুরের কলেক্টর সাহেবের কর্ত্তৃত্বাধীনে গবর্ণমেণ্ট একটি ( Papier-mache factory ) কাগজ নির্ম্মিত দ্রব্যের কারখানা খুলিয়াছেন। তথায় কোন একটী কাশ্মীরী চিত্রকরের তিনটি বালক শিষ্য-কার্য্য করিয়া থাকে। বিজনৌর জেলার মধ্যে মান্দাবার নামক গ্রামই এই কার্য্যের জন্য প্রসিদ্ধ।

---

# উপহার।



৯ই মার্চ্চ জর্ম্মানীর সম্রাট প্রথম উইলিয়াম ৯১ বৎসর বয়সে ইহলোক ত্যাগ করিয়াছেন। ইনি সমগ্র জর্ম্মানী রাজ্য একতা স্থাপন করিয়াছেন এবং কি বিদ্যানুশীলনে কি যুদ্ধ বিগ্রহে জর্ম্মানীকে আদর্শভূমি করিয়া গিয়াছেন। ইনিই জর্ম্মানীর প্রথম সম্রাট। ইনি একজন বিখ্যাত যোদ্ধা ছিলেন। সমস্ত পৃথিবী আজ ইহার শোকে সন্তপ্ত। মৃত সম্রাটের জীবনের অনেকগুলি উপদেশপূর্ণ গল্প আছে আজ তাহার কয়েকটী উপহার দিব।

এক দিন সম্রাট বার্লিন সহরের একটী রাস্তা দিয়া যাইতেছিলেন, হঠাৎ একটী ক্ষুদ্র স্কুলে ঢুকিলেন এবং মনোযোগ পূর্ব্বক ছোট ছোট ছেলে মেয়েদের পড়া শুনিতে লাগিলেন। এমন সময়ে পীয়ন আসিয়া সেই স্কুলের শিক্ষকের হস্তে এক খানি টেলিগ্রাম দিল—টেলিগ্রামে শিক্ষকটীর মাতার সাংঘাতিক পীড়ার কথা ছিল। শিক্ষক মহাশয় বড় চিন্তিত হইলেন—কিন্তু কেমন করিয়া স্কুল ফেলিয়া যাইবেন। সম্রাট শিক্ষকের মুখের বিষণ্ণভাব দেখিয়া তাহাকে টেলিগ্রামের কথা জিজ্ঞাসা করিলেন এবং সমস্ত শুনিয়া শিক্ষককে বিদায় দিলেন। এবং নিজে স্কুলের ভার লইয়া প্রায় দুই ঘণ্টা কাল শিক্ষকতা করিলেন। পরে একজন স্কুল পরিদর্শক আসিলে তাহাকে স্কুলের ভার দিলেন এবং যে পর্য্যন্ত সেই শিক্ষক ফিরিয়া না আসিয়াছিল সে

পর্য্যন্ত প্রায়ই খবর লইতেন। এই গল্পটীতে বেশ বুঝা যায় যে, সম্রাটের খুব মহৎ অন্তঃকরণ ছিল।

প্রায় সকল সভ্য জাতির মধ্যেই মান্য ব্যক্তির নিকট কোটের বোতাম খুলিয়া থাকা অসভ্যতার চিহ্ন। সম্রাটের অভ্যাস ছিল, যখনি রাজবাড়ীর প্রহরীদের বদলী হইত তখনী জানালায় দাঁড়াইয়া তাহা দেখিতেন। এক দিন এক জন প্রহরীর কোটের একটী বোতাম খোলা ছিল। সম্রাট তৎক্ষণাৎ তাহাকে ডাকিয়া খুব ধমকাইলেন এবং বলিলেন "একটী খোলা বোতাম কোটই সমস্ত সৈন্যের সর্ব্বনাশের কারণ।" একথাটী কেমন উপদেশ পূর্ণ—অনেক সময় আমরা প্রথম হইতে কোন বিষয়ের লক্ষ্য করি না—কিন্তু শেষে বিপদে পড়িতে হয়। প্রথম হইতে কোন বিষয়ের লক্ষ্য থাকিলে অনেক সময়ে আমাদিগের বিপদে পড়িবার সম্ভাবনা থাকে না। এই উপদেশ বাক্যটী সকলেরই মনে রাখা উচিত।

সদোয়ার যুদ্ধক্ষেত্রে সম্রাট ও তাঁহার প্রিয় সৈন্যদল সর্ব্বাগ্রে ছিলেন। এদিকে চারিদিক হইতে গোলা গুলি বর্ষণ হইতে লাগিল। প্রধান মন্ত্রী বিস্‌মার্ক সম্রাটের জীবন সঙ্কটাপন্ন দেখিয়া তাঁহাকে সরিয়া যাইতে বলিলেন। সম্রাট বলিলেন "আমার সৈন্যেরা কামানের মুখে আছে, আমি কেমন করিয়া সরিয়া যাইব আমার ইহাদের মধ্যে থাকাই উচিত।" অবশেষে বিস্‌মার্ক অত্যন্ত বিপদ দেখিয়া বলিলেন "আমি আপনার মন্ত্রী, আপনার জীবন এরূপ বিপদাপন্ন দেখিতে পারি না"—এই বলিয়া সম্রাটের অশ্বকে এক লাথি মারিলেন—অমনি অশ্ব সম্রাটকে লইয়া সরিয়া গেল।

সম্রাট বড় মিষ্টভাষী ছিলেন। তিনি ভৃত্যদিগের উপর কখন কর্কশ ব্যবহার করিতেন না—"তোমার এটী করা ভাল হয় নাই" ইহা অপেক্ষা কর্কশ কথা তিনি কখনও ব্যবহার করেন নাই। আমাদের ভারতেশ্বরী ২০ বৎসর পূর্ব্বে সম্রাটকে একটী বহুমূল্য বাটী উপঢৌকন দিয়াছিলেন। সম্রাট প্রত্যহ এই বাটীটি ব্যবহার করিতেন। এক দিন হঠাৎ বাটীটি ভাঙ্গিয়া গেল। যে ভৃত্য দুইটীর নিকট বাটীটি ছিল তাহারা সম্রাটকে সমস্ত বলিল। সম্রাট শুনিয়া বলিলেন "আচ্ছা বেশ, আমার কাছেও উহা ভাঙ্গিয়া যাইতে পারিত।"

সম্রাট বড় কৌতুক-প্রিয় ছিলেন। এক দিন কয়েক জন শীকারী লইয়া হরিণ শীকার করিতে গিয়াছিলেন—শীকার শেষ হইলে পর কে কয়টী হরিণ মারিয়াছে গুণিতে আরম্ভ করিলেন। শীকারীরা সম্রাটকে খোসামোদের দ্বারা সন্তুষ্ট করিবার জন্য বলিল আপনি ২৮ টী মারিয়াছেন। সম্রাট ঈষৎ হাস্য করিয়া বলিলেন—"আমি মোটে ২৫ টী গুলি আনিয়াছিলাম—আর ২৮ টী মারিলাম এত মন্দ নয়—এ একরকম অলৌকিক ঘটনা বিশেষ।—

গত ১৮ই মার্চ্চ সম্রাটের সমাধিক্রিয়া মহা সমারোহের সহিত সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। ইউরোপের প্রধান প্রধান নৃপতিরা উপস্থিত ছিলেন। বার্লিন সহর লোকাকীর্ণ হইয়াছিল। এত লোকে পূর্ব্বে কখন কোন ঘটনায় একত্র হয় নাই।

মৃত সম্রাট ছয় জন পোপ, ৮ জন সম্রাট, ৫২ জন রাজা, ৬ জন সুলতান ও ২১ জন প্রেসিডেণ্ট দেখিয়াছিলেন।

(প্রাপ্ত)

# অধ্যবসায়।

(বালকের রচনা।)

পৃথিবীতে উন্নতি সাধন করিতে হইলে সর্ব্ব প্রথমেই অধ্যবসায়ের আবশ্যক। একবার কোন কার্য্যে বিফল প্রযত্ন হইলে "হা'ল" ছাড়িয়া দেওয়া কখনও কর্ত্তব্য নয়। প্রায়ই দেখা যায় যদি কেহ একবার কোন বিষয়ে অকৃতকার্য্য হন, তবে দ্বিতীয়বার তাহার জন্য আর কোন চেষ্টা করেন না, ইহা কখনও ন্যায়সঙ্গত নয়। উৎসাহ ও অধ্যবসায় থাকিলে পৃথিবীর প্রায় সমস্ত মহৎ কার্য্যই সম্পাদনে সমর্থ হওয়া যায়। অনেকের মুখেই শুনা যায় যে, আমি ইহা "পারি না", যদি পৃথিবীতে বড় লোক হইতে চাও তবে "পারি না" কথাটি ছাড়িয়া দিতে হইবে।

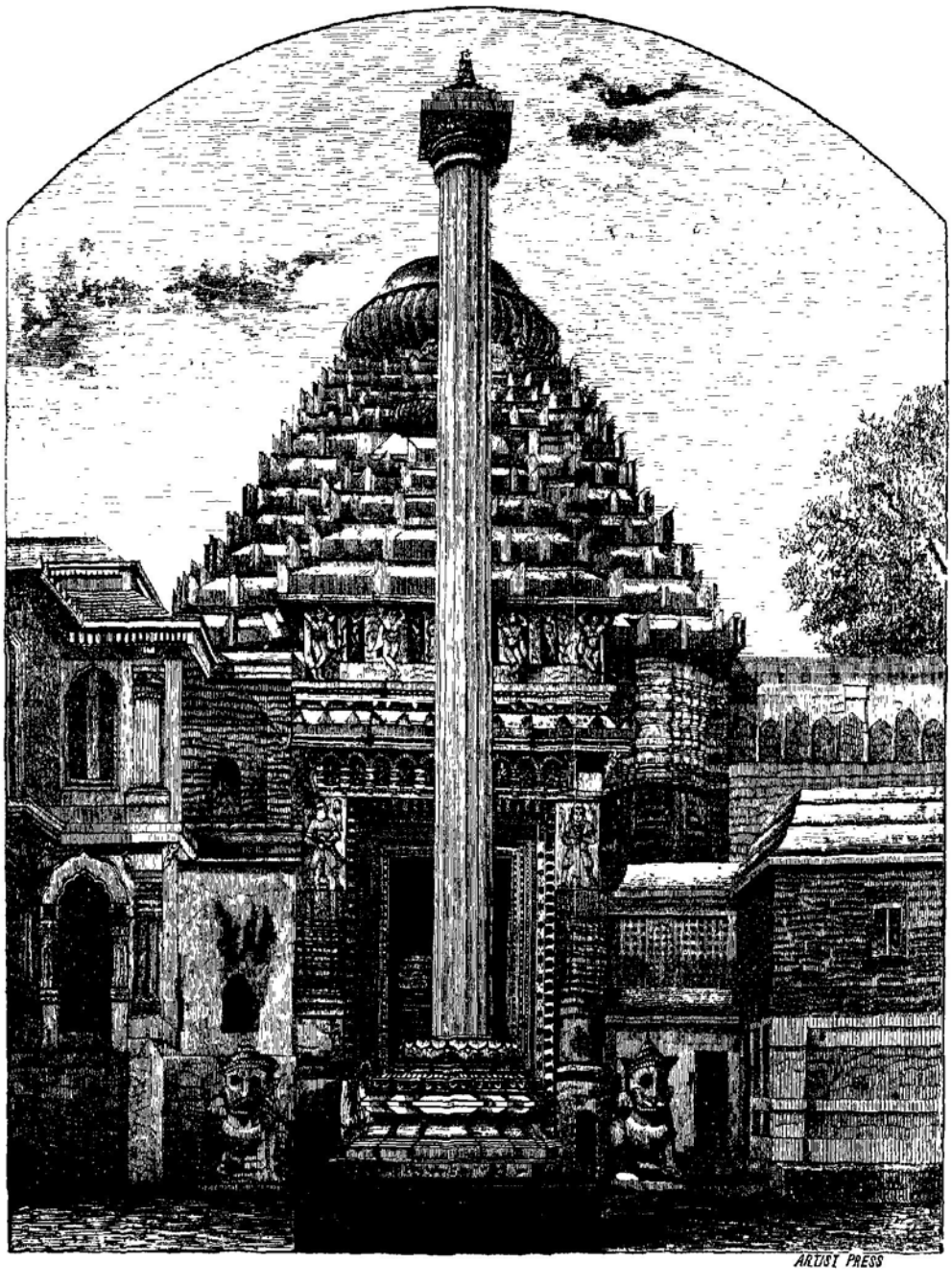
এক জন দার্শনিক পণ্ডিত বলিয়াছেন "অন্যে যাহা করিয়াছে প্রত্যেকেই তাহা করিতে পারে।" সর্ব্ব কার্য্য সম্পাদনের জন্য প্রথম দৃঢ় ইচ্ছা চাই—ইচ্ছা থাকিলেই তাহার পথ আছে—যদি ইচ্ছা থাকে তবে নিশ্চয়ই কৃতকার্য্য হইতে পারা যায়। লোকে কথায় বলিয়া থাকে মনুষ্যের অসাধ্য কর্ম্ম নাই, এই কথাটি সম্পূর্ণ যথার্থ। এই যে এক্ষণ বিজ্ঞানের উন্নতিতে রেল, তার প্রভৃতি দেখিতেছ ইহা এক দিনের পরিশ্রমে সম্পন্ন হয় নাই, ইহাতে অনেক অধ্যবসায় ও অনেক পরিশ্রমের আবশ্যক হইয়াছে।

যদি মানুষ বলিয়া পরিচিত হইতে ইচ্ছা কর তবে সুখে সচ্ছন্দে গৃহে বসিয়া থাকিলে হইবে না। এক জন পণ্ডিত বলেন "ঘুড়ী বাতাসের বিপরীত দিকেই উড়ে, কিন্তু যে দিক্ হইতে বায়ু বহে সে দিকে উড়ে না, সেই প্রকার পৃথিবীতে বড় লোক হইতে হইলে সুখে সচ্ছন্দে বসিয়া থাকিলে হইবে না।" অধ্যবসায় চাই, পরিশ্রম চাই, যত্ন চাই।

এই যে আজকাল রেলের গাড়ী দেখিতেছ—যাহাতে ৭ দিনের পথ একদিনে যাইতেছ,—ইহার উৎপত্তি কিসে জান? জেমস্ ওয়াট্ কটাহে চা জাল দিবার সময় দেখিলেন যে, কটাহের উপরস্থ আবরণ (ঢাকনী) একবার বাষ্পের বেগে উপরে উঠিতেছে আবার পড়িতেছে, ইহা দেখিয়া তাহার মনে প্রথম উদিত হইল যে, বাষ্পের জোর আছে, তিনি অনেক পরিশ্রম করিয়াও আর অধিক কিছু করিতে পারিলেন না, অবশেষে জর্জ ষ্টিফেন্সন অনেক পরিশ্রম অনেক অধ্যবসায়ের পর রেলের গাড়ীর প্রথম সৃষ্টি করিলেন। ইহা চালাইবার ৩০ বৎসর পূর্ব্ব হইতে এই বিষয়ে কত চেষ্টা করিয়াছিলেন, কতবার বিফল প্রযত্ন হইয়াছিলেন। অনেক পরিশ্রম অনেক অধ্যবসায়ের পর শেষে কৃতকার্য্য হন। কি আশ্চর্য্য অধ্যবসায়।

একটি ইংরাজী প্রবাদ আছে যে "রোম একদিনে নির্ম্মিত হয় নাই" ইহার ভাবার্থ এই যে কোন মহৎ কার্য্যই এক দিনের পরিশ্রমে সম্পন্ন হইতে পারে না, অনেক ধৈর্য্য, অনেক অধ্যবসায়ের দরকার।

তোমরা কি স্কটলণ্ডের রাজা রবার্ট ব্রুসের নাম শুন নাই? তিনি যখন বার বার ইংরেজের সহিত যুদ্ধে পরাজিত হইতে লাগিলেন, যখন তাঁহার হৃদয়ের সমস্ত আশা ভরসা বিলুপ্ত হইল, তখন তিনি একদিন নিরাশ হৃদয়ে একটি পর্ব্বস্থ গুহায় বসিয়াছিলেন, তাঁহার চিত্ত চিন্তায় অস্থির, তিনি ভাবিলেন আর যুদ্ধ করিব না, এমন সময়ে দেখিতে




শ্রীশ্রী৺ জগন্নাথ দেবের মন্দির।

পাইলেন যে, একটী মাকড়সা তাহার জালে উঠিতে চেষ্টা করিতেছে আবার পড়িয়া যাইতেছে, একবার, দুইবার করিয়া ছয়বার পড়িয়া গেল তথাপিও চেষ্টা করিতে লাগিল অবশেষে ৭ম বারে উঠিতে সক্ষম হইল। ইহা দেখিয়া ব্রুসের মনে এক আশ্চর্য্য ভাবের উদয় হইল, তাঁহার মনের গতি ফিরিয়া গেল, তিনি মনে মনে দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করিলেন, যে প্রকারে হউক স্কট্‌লণ্ড স্বাধীন করিব। তিনি নবীন উৎসাহে কার্য্যক্ষেত্রে প্রবেশ করিলেন, অবশেষে যুদ্ধে জয়লাভ করিলেন।

এমন না হইলে কি সংসারে বড় হইতে পারে, যদি বড় হইতে চাও তবে ব্রুসের ন্যায় অধ্যবসায়ী হও। অধ্যবসায় ও পরিশ্রমের উপরেই সমস্ত নির্ভর করে, ডাক্তার আর্ণল্ড বলেন বিদ্যালয়ে সাধারণতঃ দেখা যায় একটী বালক অন্যটি হইতে ভাল, তাহার কারণ যে কেবল অন্যটির মেধা বেশী তাহা নহে, উৎসাহ ও অধ্যবসায়ই তাহার প্রধান কারণ। যদি পৃথিবীতে গণ্য মান্য হইতে চাও তবে অধ্যবসায়ী হও। তোমরা কি ব্রুহামকে জান? তিনি ৬০ বৎসর কাল আশ্চর্য্য অধ্যবসায় ও ঘোরতর পরিশ্রম করিয়া অবশেষে রাজনীতি, বিজ্ঞান, সাহিত্য প্রভৃতি সর্ব্ব শাস্ত্রে সুপণ্ডিত হন। তিনি এতদূর অধ্যবসায়ী ছিলেন যে, লোকে বলিত যদি তিনি চর্ম্মকারের ব্যবসায় অবলম্বন করিতেন, তথাপিও তাহাতে সমস্ত ইংলণ্ডে প্রথম না হইয়া ছাড়িতেন না।

যত্নের সহিত অধ্যবসায় থাকিলে অসম্ভবও সম্ভব হয়। পৃথিবীতে যত বড়লোক জন্মিয়াছিলেন সকলই "অসম্ভব" কথাটিকে বড় ঘৃণা করিতেন। জগদ্বিখ্যাত মহাবীর নেপোলিয়ান বলিতেন যে "অসম্ভব কথাটি কেবল মূর্খদের অভিধানে পাওয়া যায়"। কেরী সাহেবের নাম সকলের নিকটই সুপরিচিত। তাঁহার বাল্যকালের একটি সুন্দর গল্প আছে। তিনি যে ভাবী জীবনে অধ্যবসায়ী ও বড় হইতে পারিবেন তাহা এই গল্পে স্পষ্ট বুঝা যাইত। একদা তিনি একটি বৃক্ষে আরোহণ করিতেছিলেন হঠাৎ তিনি পা পিছলাইয়া ভূমিতে পড়িয়া গুরুতর আঘাত প্রাপ্ত হন। এমন কি পা ভগ্ন হইয়া যায়, ইহাতে তিনি কতক দিন শয্যাগত ছিলেন, যখন তিনি পুনর্ব্বার আরোগ্য লাভ করিলেন, তখন তিনি প্রথমে সেই বৃক্ষে চড়িলেন, তবে ছাড়িলেন। দেখ দেখি কি আশ্চর্য্য অধ্যবসায়!

কেরী যে ভাবী জীবনে বড় হইতে পারিয়াছিলেন এই তাহার প্রধান কারণ।

অতএব ভ্রাতা ভগ্নীগণ। যদি পৃথিবীতে বড় হইতে চাও মানব সমাজে গণ্য হইতে চাও, তবে অধ্যবসায়ী হও। নদীতে ঝড় দেখিয়া কূলেই "হা'ল" ছাড়িয়া দিও না।

## জগন্নাথ।



নারদ ঋষি তাঁহার শিষ্যের নিকট অনেক তীর্থ স্থানের বিষয় বর্ণনা করিয়া বলিয়াছিলেন পৃথিবীর মধ্যে ভারতবর্ষ সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ স্থান এবং ভারতবর্ষের মধ্যে উৎকল প্রদেশ সর্ব্বা-

পেক্ষা প্রসিদ্ধ। বাস্তবিক দুই সহস্র বৎসর ধরিয়া উড়িষ্যা হিন্দুদিগের নিকট পবিত্র তীর্থক্ষেত্র বলিয়া পরিগণিত। সৌভাগ্যক্রমে ঐ দেশেই যাঁহাদের বাস তাঁহাদের কপালে স্বর্গভোগ নিশ্চয়ই। যাঁহারা একবার মাত্র দর্শন করিয়াছেন, ইহার পবিত্র নদীতে একবার মাত্র অবগাহন করিয়াছেন তাঁহাদের পাপের বোঝা পাহাড়ের মত ভারি হইলেও সকল দোষ হইতে মুক্ত হইবেন। স্বয়ং দেবতারা এই স্থানে থাকিতে ভাল বাসেন। হিন্দুদের এইরূপ বিশ্বাস।

উড়িষ্যা চারিটী বৃহৎ তীর্থক্ষেত্রে বিভক্ত। তীর্থযাত্রী বৈতরণী নদী পার হইয়া যখন কটকের বিশ ক্রোশ উত্তরে প্রশস্ত পথে উপস্থিত হন তখনই পবিত্র ভূমিতে পদার্পণ করেন। তখন যাত্রীর মনের ভাব কি? পশ্চাতে সংসারের দুঃখ যন্ত্রণা, চিন্তা ক্লেশ, তুচ্ছ আমোদ আহ্লাদ সমস্ত ফেলিয়া আসিয়াছে—সম্মুখে স্বর্গের পথ, এতদিনের আশা সফল হইল, স্বয়ং ভগবানকে দেখিতে পাইবে সকলই সুখ ও শান্তিময়। বৈতরণী নদী তীরেই যমালয়। 'যমালয়ে মহাঘোরে তপ্তা বৈতরণী নদী'। হিন্দুর মরণ কালে ঐ কথাগুলি তাঁহার কর্ণে উচ্চারণ করিতে হয়। তীর্থ যাত্রীর নদী পার হইবার সময়েও ঐ কথা শুনিতে হয়।

পুরী বা শ্রীক্ষেত্র ভারতের প্রসিদ্ধ তীর্থস্থান। প্রতি বৎসর লক্ষ লক্ষ নর নারী এইখানে তীর্থ করিতে আইসেন। এইখানে জগন্নাথ দেবের প্রসিদ্ধ মন্দির আছে। আমরা এবার জগন্নাথ দেবের মন্দিরের কেমন বড় ও সুন্দর ছবি দিলাম। মন্দিরের চতুর্দ্দিকের স্থান প্রস্তরের বৃহৎ প্রাচীরে বেষ্টিত। এই বেষ্টিত আয়তনের ভিতর অনেকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মন্দির আছে। জগন্নাথ দেবের মন্দিরটী ১২৬ হাত উচ্চ, কলিকাতার মনুমেণ্ট অপেক্ষা দেড় গুণ উচ্চ। মন্দিরটী আগাগোড়া সুন্দর কারুকার্য্যে খোদিত। ইহাতে যেরূপ শিল্প নৈপুণ্য দেখা যায় তাহাতে আমাদের দেশের পূর্ব্বকালের কারিকরেরা নিজ নিজ ব্যবসায়ে যে কতদূর উন্নতি সাধন করিয়াছিল তাহার বেশ পরিচয় পাওয়া যায়। মন্দিরটী পর পর চারি ভাগে বিভক্ত। বাহিরে সিংহদ্বারের সম্মুখে একটী অতি উচ্চ স্তম্ভ আছে। তৎপরে প্রাচীর বেষ্টনের মধ্যে প্রবেশ করিয়াই বিস্তৃত প্রাঙ্গন, এইখানে তীর্থযাত্রীরা দল বদ্ধ হইয়া থাকে। প্রথমেই যে প্রকোষ্ঠ—সেটী ভোগ গৃহ; তার পর বড় বড় থাম যুক্ত প্রকাণ্ড হল—এটী নাট মন্দির, এইখানে নর্ত্তকীরা নৃত্য ও গায়ক গায়িকারা গান করিতে থাকে। তৎপরে দেবতা দর্শনের নিমিত্ত যাত্রীদিগের দাঁড়াইবার স্থান—এই গৃহের নাম জগমোহন। তৎপরেই আসল দেবালয়। এইখানে বেদীর উপর জগন্নাথ দেব তাঁহার ভ্রাতা বলভদ্র এবং ভগিনী সুভদ্রার সহিত উপবিষ্ট আছেন। সকলেই বস্ত্রালঙ্কারে ভূষিত। মূর্ত্তিগুলি কাষ্ঠের। রূঢ়ভাবে মনুষ্যাকৃতিতে খোদিত। বিগ্রহগুলি হস্তপদাদি বিহীন। মহোৎসবের সময়ে পুরোহিতেরা সোণার হাত পা পরাইয়া দেয়। দেবতার হাত পা নাই কেন? যিনি বিশ্বের পতি তাঁহার ক্ষমতা অসীম। তাঁহার মনোরথ সিদ্ধির নিমিত্ত সামান্য মানবের ন্যায় হস্ত পদের আবশ্যক হয় না। ঈশ্বর যে নিরাকার এ ভাব ব্যক্ত করিবার এটী অতি সহজ উপায়।

দেবতার নিকট উপহার দিতে হয়। দেবতা ছাগ মহিষ চাহেন না। ইনি কোন জীবের রক্তপাত দেখিতে পারেন না। রক্তপাতে সমস্ত মন্দির অপবিত্র হইয়া যায়। দুগ্ধ, ঘৃত, তণ্ডুল, অন্ন, ব্যঞ্জন, ফল মূলাদিতেই দেবতা সন্তুষ্ট। মন্দিরে অপমৃত্যু ঘটিলে সমস্ত মন্দির অপবিত্র হয়। দেবতা ক্রোধ

যুক্ত হয়েন। হঠাৎ পূজা থামিয়া যায়। শীঘ্র শীঘ্র সেই অপবিত্র বলি ক্রুদ্ধ দেবতার সমক্ষ হইতে সরাইয়া লইয়া যাইতে হয়। জগন্নাথ দেবের রথের তলায় পড়িয়া প্রাণ দিলে যে স্বর্গলাভ হয় সেটা ভুল। দেবতা তাহাতে সন্তুষ্ট নহেন। অনেক ধর্ম্মগ্রন্থে রথের উল্লেখ আছে কিন্তু কোথাও এইরূপে আত্মহত্যার মহত্ত্ব দৃষ্ট হয় না। এই প্রথা পূর্ব্বে প্রচলিত ছিল না। বহুল পরিমাণে প্রচলিত থাকিলে বিধর্ম্মী মুসলমান ইতিহাস লেখক আবুল ফজল অন্যান্য বিষয়ের সহিত জগন্নাথের ঐ প্রথারও উল্লেখ করিতেন। তবে হঠাৎ শোকে বধ চাপা পড়িয়া মরিত অথবা রোগে কষ্টে জর্জ্জরিত হইয়া যাহাদের জীবনধারণ কষ্টকর হইয়া উঠিত তাহারাই আত্মহত্যা করিত। কেহ কেহ নির্ব্বুদ্ধিতাবশতঃ ঐরূপে আত্মহত্যা করিত। মনে করিত ঐরূপ আচরণে দেবতা প্রসন্ন হইবেন।

শ্রীক্ষেত্রে জাতি ভেদ নাই। ঈশ্বরের সমক্ষে সকলেই সমান, এখানে জাতি ভেদ নাই, পদ মর্য্যাদা নাই, ঐশ্বর্য্যের গৌরব নাই, ব্রাহ্মণে চণ্ডালে প্রভেদ নাই, ধনী দরিদ্রের ভেদ নাই। হিন্দু দেবতা জগন্নাথ দেব এই শিক্ষা দেন। ঈশ্বরের সমক্ষে উপস্থিত হইতে হইলে সামান্য কীটের ন্যায় বিনীত হইতে হয়। তাই যাত্রী যখন জগন্নাথ দেখিতে উপস্থিত হন তখন তাঁহাকে নীচ জাতির ঝাঁটা খাইতে হয়। চণ্ডালের নিকট হইতেও অন্ন লইয়া খাইতে হয়। এখানে উদ্ধতের যে কি দুর্দ্দশা হয় তাহার অনেক গল্প আছে। একবার উত্তর ভারতবর্ষ হইতে কোন দাম্ভিক ধনপতি জগন্নাথ দর্শনে আইসেন। তিনি মনস্থ করিয়াছিলেন কেবল দেবতা দর্শন করিবেন, মানবের বা দেবতার কোন উচ্ছিষ্ট গ্রহণ করিবেন না। পুরীতে উপস্থিত না হইতেই তাঁহার হাত পা খসিয়া পড়িয়া গেল, পথের পার্শ্বে দুই মাস পর্য্যন্ত শোচনীয় অবস্থায় পড়িয়া রহিলেন। একদিন একটী কুকুর জগন্নাথের মহাপ্রসাদ খাইতে খাইতে তাঁহার নিকট আসিয়া তাহার কিয়দংশ ফেলিয়া চলিয়া গেল। সেই অহঙ্কারী ব্যক্তি বুকে হাঁটিয়া সেই কুকুরের মুখের উচ্ছিষ্ট ভক্ষণ করিলেন। তখন জগন্নাথ দেব দয়াপরবশ হইয়া দর্শন দিলেন। ধনপতি নূতন হস্ত পদ লাভ করিয়া বিনীত শিষ্যের ন্যায় শ্রীক্ষেত্রে প্রবেশ করিলেন। "ঈশ্বরের কৃপা জাতি কুল নাহি মানে।"

"নমে ভক্তশ্চতুর্ব্বেদী, মদ্ভক্তঃ স্বপাকঃ প্রিয়ঃ।
তস্মৈদেয়ম্ ততো গ্রাহ্যম্ স চ পূজ্যো যথাহহম্ ॥"

চারি বেদ যাঁহার আয়ত্ত তিনিও আমার প্রিয় নহেন, ভক্তিমান চণ্ডাল আমার প্রিয়, তাঁহাকেই দেয় এবং তাঁহা হইতেই গ্রহণীয়। আমার ন্যায় তিনিও পূজার পাত্র।

জগন্নাথের বিষয় এইরূপ প্রবাদ আছে। সত্য যুগের পর এক সময়ে বিষ্ণু পৃথিবী হইতে অদৃশ্য হয়েন। লোকে তাঁহাকে চতুর্দ্দিকে অন্বেষণ করে কোথাও পায় না। ইন্দ্রদ্যুম্ন নামে মালব দেশে এক পরম বৈষ্ণব রাজা ছিলেন। তিনি বিষ্ণুর উদ্দেশে চতুর্দ্দিকে ব্রাহ্মণ প্রেরণ করেন। সকলেই হতাশ হইয়া ফিরিলেন, যিনি পূর্ব্বদিকে গিয়াছিলেন তিনি ফিরিলেন না। ইনি পূর্ব্বদেশের গভীর অরণ্যে প্রবেশ করিয়া উড়িষ্যার শবর বা ব্যাধ জাতীয় বসুর (কেহ কেহ বলেন বাসু) ভবনে উপস্থিত হন। বসু খুব অতিথি সৎকার করে। কিন্তু নিজে নীচ জাতি, শ্রেষ্ঠ জাতির সহিত সম্বন্ধ পাতাইয়া উচ্চ হইবে মনে করিয়া প্রাণ সংহারের ভয় দেখাইয়া বলপূর্ব্বক ব্রাহ্মণকে আপনার কন্যার সহিত বিবাহ দিল। বিবাহ করিয়া ব্রাহ্মণ কোথায়ও যাইতে পান না। বসু প্রতিদিন